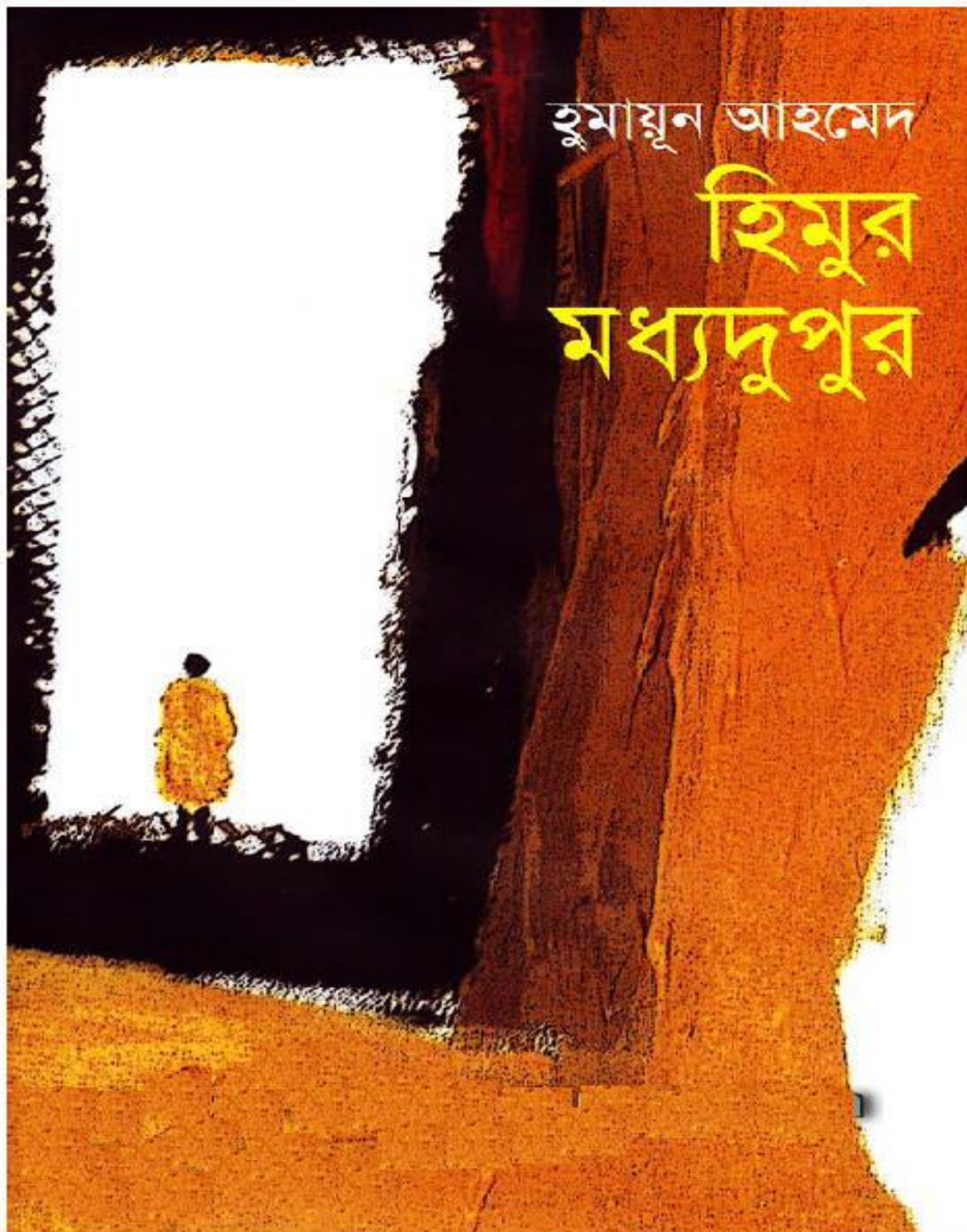
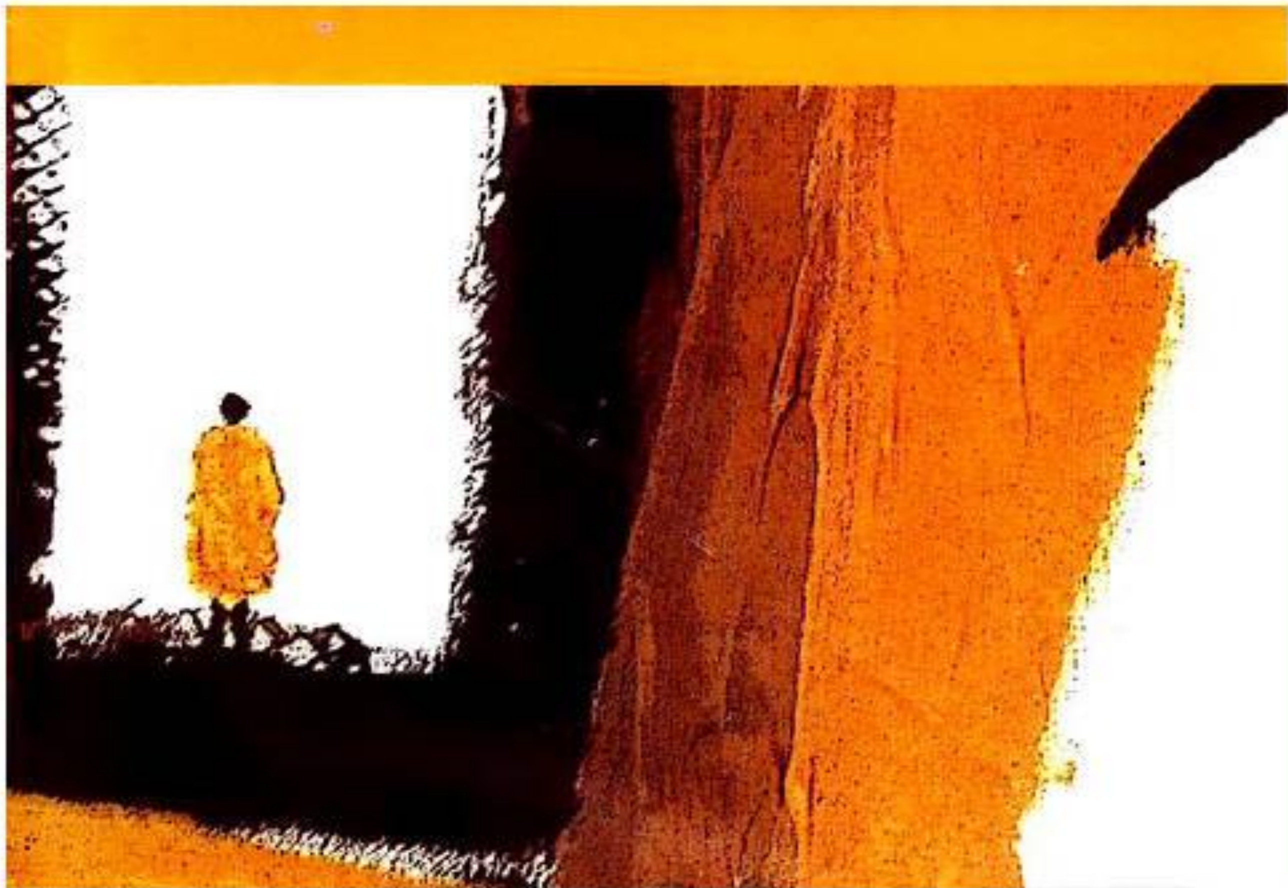

হুমায়ূন আহমেদ
হিমুর
মধ্যদুপুর



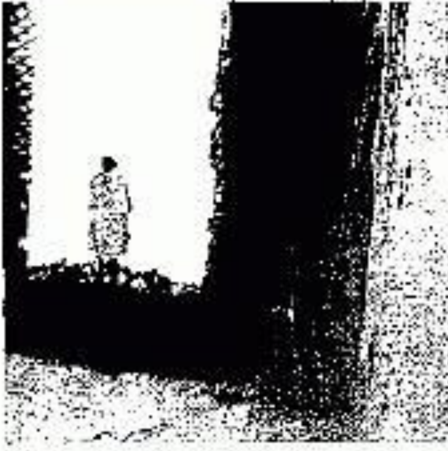
মধ্যদুপুর বড়ই আশ্চর্য সময়। তখন "ভূতে মারে ঢিল"। এবং অদ্ভুত কোনো কারণে কিছু সময়ের জন্য আকাশটা আয়না হয়ে যায়।

হিমু হাঁটতে বের হয়েছে মধ্যদুপুরে। তার হাতে ছোট্ট একটা দুপুরমনি গাছের চাড়া। সেখানে চার পাঁচটা ফুল। এখনো ফুটেনি। মধ্যদুপুরে ফুটবে। হিমু ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকাবে। নিজেকে দেখার চেষ্টা করবে আকাশ আয়নায়।

উৎসর্গ

নওশাদ চৌধুরী
প্রিয়বরেষু
অসম্ভব প্র্যাটিক্যাল একজন মানুষ।
মাথায় ব্যবসা নিয়ে নানান পরিকল্পনা।
তারপরেও তাঁর মধ্যে আমি হিমুর
ছায়া দেখি এবং অবাক হই।

"মধ্যদুপুর খুব আশ্চর্য সময়
তখন মানুষের ছায়া পড়ে না।"



'হিমু, তুই আমাকে একটা কিডনী দিতে পারবি ? আমার একটা কিডনী দরকার।'

মানুষজনের কথায় হকচকিয়ে যাওয়া কিংবা বিভ্রান্ত হওয়া আমার স্বভাবে নেই। তারপরেও মাজেদা খালার কথায় হকচকিয়ে গেলাম। ধানমন্ডি ২৭ নাম্বার রোডে গাড়ি থামিয়ে তিনি আমাকে ধরেছেন। এখন কিডনী চাচ্ছেন। তাঁর কথার ভঙ্গিতে বিরাট তাড়াহুড়া। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই কিডনী দরকার।

'কথা বলছিস না কেন ? একটা কিডনী দিবি ?'

'কেন দেব না ?'

'থ্যাংকস, গাড়িতে উঠ। ড্রাইভারের পাশে বোস। চল বাসায় যাই।'

'কিডনী কি বাসায় নিয়েই কেটে কুটে রেখে দেবে ? ডাক্তার কাটবে না-কি তুমি নিজেই কাটবে ? ধারালো স্টেরিলাইজড ছুরি-কাঁচি আছে তো ?'

'অকারণে কথা বলিস কেন ? গাড়িতে উঠ।'

আমি গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে AC চলছে। আরামদায়ক শীতলতা। বাইরে বৈশাখ মাসের ঝাঁঝালো রোদ। শহর পুড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা। এই রোদের একটা নাম আছে— কাকমরা রোদ। কাকের মতো কষ্টসহিষ্ণু পাখিও এই রোদে হিট স্ট্রোকে মারা যায়। আমি আজ দুটা কাককে মরে থাকতে দেখেছি। মৃত্যুর পর কাকরা কোথায় যায় কে জানে। তাদেরও কি স্বর্গ-নরক আছে ? কাকদের স্বর্গ কেমন হবে ? আমার ধারণা তাদের স্বর্গে একটু পরপর থাকবে ডাস্টবিন। ডাস্টবিন ভর্তি ময়লা-আবর্জনা। ফেলে ছড়িয়ে আবর্জনা খাও। কেউ কিছু বলবে না।

খালা বললেন, 'কিডনী দিতে হবে শুনে তুই দেখি ভ্যাবদা মেরে গেছিস। দুটা কিডনী মানুষের কোনো দরকার নেই। একটাতেই হেসেখেলে দিন চলে।'

আমি বললাম, 'দুটা কিডনীতেও তো অনেকের চলে না। অন্যদেরটা নিতে হয়।'

খালা বললেন, 'বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। এই গরমে তর্ক শুনতে ভাল লাগে না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আর তর্ক করব না। শীত আসুক। নগর শীতল হোক। তখন তর্ক।'

'আখের রস খাবি ? গরমের সময় আখের রস শরীরের জন্যে ভাল। অনেক এন্টি ওক্সিডেন্ট আছে। খাবি ?'

'খাব।'

'দুটা আখ থেকে এক গ্লাস রস পাওয়া যায়। হালকা সবুজ কালার। এর মধ্যে লেবুর রস আর সামান্য বিট লবণ দেয়, বরফের কুচি দেয়। খেতে অসাধারণ। আমি রোজ এক গ্লাস করে খাচ্ছি।'

'জন্ডিস এখনো হয় নাই ?'

'জন্ডিস হবে কোন দুঃখে ? আখওয়ালা আমার পরিচিত লোক। নাম সুলেমান। নরসিংদি বাড়ি। সে আমার সামনে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে আখ মাড়াইয়ের যন্ত্র ধুবে। আখও ধোয়া হবে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে। তার কাছ থেকে অনেক ফরেনারও আখের রস খায়।'

'কোন দেশী ফরেনার সেটা হিসাবে রাখতে হবে। ইউরোপীয়ান ফরেনার না সোমালিয়ান ফরেনার।'

'হিমু! একবার বলেছি, আবারো বলছি, তুই বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। আমাকে ফরেনার শিখাবি না। আগামী আধাঘন্টা একটা শব্দ উচ্চারণ করবি না। আমি যা বলব শুধু শুনে যাবি।'

'ওকে।'

'ওকে ফোকেও বলবি না।'

আমি নিঃশব্দে মাজেদা খালার সঙ্গে আখের রস খেলাম (জিনিসটা ভাল)। পাশেই ক্ষিরা কেটে বিক্রি করছে। খালা ক্ষিরা খেলেন। একজন কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখিয়ে বিক্রি করছিল। পাঁচ টাকা প্লেট। আমরা তাও খেলাম। সবশেষে তরমুজ।

খালা বললেন, 'গরমের সব ওষুধ শরীরে নিয়ে নিলাম। শরীরের ডিহাইড্রেশন বন্ধ করার ব্যবস্থা হল। বুঝলি ?'

==

আমার কথা বলা নিষেধ। কাজেই হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম যে— 'বুঝেছি'। মাজেদা খালা, খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কিডনী প্রসঙ্গও খোলাসা করলেন। তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের দু'টা কিডনীই নষ্ট। ডায়ালাইসিস করে দিন কাটছে। তাকে কিডনী দিতে হবে। তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট করতে।

'হিমু! তুইও উনার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যাবি। ফাঁকতালে তোর বিদেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে। ভাল না?'

'ভাল।'

'পত্রিকায় প্রায়ই এ্যাড দেখি কিডনী বিক্রি করতে চায়। ওরা ফকির-মিসকিন। ওদের কিডনী কেনার মানে হয় না।'

'ফকির মিসকিনের কিডনী আর প্রেসিডেন্ট বুশের কিডনীতো একই।'

'আবার কথা বলা শুরু করেছিস? তোকে না বললাম আধাঘন্টা কথা বলবি না।'

'সরি।'

'যাকে কিডনী দিবি তাঁর সঙ্গে যখন পরিচয় হবে তখন তোর মনে হবে একটা কেন? দুটা কিডনীই দিয়ে দেই। এমন অসাধারণ মানুষ। বুঝেছিস?'

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

খালা বললেন, 'আমরা ছোটবেলায় তাঁকে ডাকতাম, মুরগি। উনি বই পড়ার সময় নিজের অজান্তেই মুরগির মতো কক কক করেন এই জন্যে মুরগি নাম। তোকে গাড়ি দিয়ে তাঁর কাছে পাঠাব। ঠিকানা দিয়ে পাঠালে তুই যাবি না। আমাকে বলবি— ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিস। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। যাকে কিডনী দিবি তাঁর নাম পল্টু। অসাধারণ মানুষ। পরিচয় হলেই বুঝবি। উনার দশটা কথা শুনলেই তুই তাঁর কেনা গোলাম হয়ে যাবি। তুই তাঁকে বলবি, আপনি আমার কিডনী, হার্ট, লিভার সব নিয়ে নিন।'

'শুধু চামড়াটা নিয়ে আমি বাঁচব কীভাবে?'

'কথার কথা বলছি রে গাধা।'

যার নাম পল্টু এবং যাকে ডাকা হতো মুরগি; তার বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার কারণ নেই। বিশেষ করে মাজেদা খালা যাকে অসাধারণ বলেন তার বোকা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বলা হয়ে থাকে, বুদ্ধিমানের কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকবে আর বোকাদের কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকবে। দূরে থাকা সম্ভব হল না। খালা গাড়ি করে সেইদিনই পল্টু সাহেবের কাছে পাঠালেন। খালা হচ্ছেন 'ধর তক্তা মার পেরেক' টাইপ মহিলা। দেরি সহ্য করার মেয়ে না।

==

আমি পল্টু সাহেবের সামনে বসে আছি। ভদ্রলোক বেতের ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। মাথার নিচে বালিশ। হাতে একটা চটি ইংরেজি বই নাম Love of Lucy লুসির প্রেম। বইয়ের কভারে একটা অর্ধনগ্ন বিশাল বক্ষা মেয়ের ছবি। মনে হচ্ছে এই মেয়েটিই লুসি। লুসি যার প্রেমে পড়েছে তার ছবিও কভারে আছে। বডি বিল্ডার টাইপ এক নিগ্রো। সে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে লুসিকে জড়িয়ে ধরে আছে। কুস্তিগীর লুসির ঘাড়ে চুমু খাচ্ছে। কিন্তু ছবি দেখে মনে হচ্ছে সে লুসির ঘাড় কামড়ে ধরেছে এবং ড্রাকুলার মতো রক্ত চুষে খেয়ে নিচ্ছে। লুসি তাতে মোটেই দুঃখিত না, বরং আনন্দিত।

পল্টু সাহেব গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকতে বলেছেন। মনে হচ্ছে লুসির প্রেমের শেষ পরিণতি না জেনে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। ভদ্রলোকের মুরগির মতো কক কক শব্দ করার কথা। তা করছেন না। কক কক শব্দ করার মত ভাল বোধ হয় এই বই না।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মতো, ভয়ংকর রোগা। গায়ের রঙ অতিরিক্ত ফরসা। কিছু কিছু চেহারা আছে দেখেই মনে হয় আগে কোথায় যেন দেখেছি। এ রকম চেহারা। আইনস্টাইনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটা মিল আছে। মাথায় বাবরি চুল। মুখে গোঁফ। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন খালি গায়ে। লুঙ্গি পরেছেন। সেই লুঙ্গি দূরবর্তী বিপদ সংকেতের মতো হাঁটুর উপর উঠে আছে। কখন দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানে!

পল্টু সাহেব তার পা জলচৌকিতে রেখেছেন। পায়ের কাছে টেবিল ফ্যান। সেই ফ্যান শুধুমাত্র পায়ে বাতাস দিচ্ছে। ঘটনাটা কি বুঝা যাচ্ছে না। ঘটনা বুঝতে হলে লুসির প্রেম কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভদ্রলোক বাস করেন গুলশান এলাকার ফ্ল্যাট বাড়িতে। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। লেকের পাশে। একটা আধুনিক ফ্ল্যাট যতটা নোংরা রাখা সম্ভব তা তিনি রেখেছেন। মনে হচ্ছে ঘর পরিষ্কার করার কেউ নেই। যেখানে সেখানে বই পরে আছে। বেশ কিছু সিগারেটের টুকরা ভর্তি আধ খাওয়া চায়ের কাপ। একটা চায়ের কাপ মেঝেতে কাত হয়ে আছে; অনেকখানি জায়গা জুড়ে চা শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। পিঁপড়েরা খবর পেয়ে গেছে। তবে রান্নাঘর তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। রান্নাঘরের ব্যবহার মনে হয় নেই।

বাথরুমে উঁকি দিলাম। বাথটাব ভর্তি ভেজা কাপড়। কমোডের কাছে সবুজ রঙের একটা তোয়ালে। বেসিনের উপর একটা পিরিচে আধ খাওয়া কেক এবং কলার খোসা। বোঝাই যাচ্ছে, পল্টু সাহেব বাথরুমে খাওয়া-দাওয়া করা দোষণীয় মনে করেন না।

==

ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা বলতে দেয়ালে একটি বিশাল সাইজের বাঁধানো চার্লি চ্যাপলিনের ছবি। আরেকটা মাঝারি সাইজের আইনস্টাইনের ছবি। আইনস্টাইন জিভ বের করে ভেংচি কাটছেন।

পল্টু সাহেব লুসির প্রেম কাহিনী পড়ে শেষ করেছেন। বই পড়ে আনন্দিত হলেন কি-না বুঝতে পারছি না। ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি বই মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'নাম বল।'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'নাম লাভ অব লুসি।'

'বইয়ের নাম জানতে চাচ্ছি না। বইয়ের নাম জানি। তোমার নাম বল।'

'স্যার, আমার নাম হিমালয়।'

হিমালয় নাম শুনলে সবার মধ্যেই কিছু কৌতূহল দেখা যায়। তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। যেন মানুষের নাম হিসেবে হিমালয়, এভারেস্ট, মাউন্ট ফুজি জাতীয় নাম শুনে তিনি অভ্যস্ত।

পল্টু সাহেব ইজি চেয়ারের হাতলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, 'চুরির অভ্যাস আছে?'

'না।'

'সত্যি বলছতো?'

'জ্বি স্যার।'

তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিতে দিতে বললেন, 'তুমি সত্যি বলছ না। চুরির অভ্যাস নেই এমন মানুষ তুমি কোথাও পাবে না। বড় মানুষরা আইডিয়া চুরি করে। বিজ্ঞানীরা একজন আরেকজনের আবিষ্কার চুরি করেন। মানব জাতির সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে চুরির উপর বুঝেছ?'

'জ্বি স্যার।'

'বেতন কত চাও বল? কত হলে পুষাবে সেটা বল। বেতন নিয়ে মুলামুলি করার সময় আমার নেই।'

আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। মনে হচ্ছে বাসার চাকর হিসেবে তিনি আমাকে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলবেন।

'আগে যে ছিল সে মহাচোর। টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার, ডিভিডি সেট নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওর নাম হাশেম। টাকা-পয়সাও নিয়েছে। কত নিয়েছে বের করতে পারি নি। তুমি কি চুরি করবে আগে ভাগে বল। আমি সোজাসুজি আলাপ পছন্দ করি। বল কি চুরি করবে?'

'যা ছিল সবতো আগেরজন নিয়েই গেছে। আমি আর কি নেব। হাশেম ভাইজানতো আমার জন্যে কিছু রেখে যান নি।'

==

'আগেরজনকে মাসে তিন হাজার টাকা দিতাম প্লাস থাকা-খাওয়া। চলবে ?'

'জ্বি স্যার, চলবে।'

'রান্না করতে জান ?'

'না।'

'না জানলেও সমস্যা নেই। রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে তারা খাবার দিয়ে যায়। এটা একদিক দিয়ে ভাল। রান্নাঘরে চুলা জ্বলবে না। মসলার গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ আমার কাছে অসহ্য লাগে। কাপড় ধুতে পার ? ওয়াসিং মেশিন আছে। ওয়াশিং মেশিনে ধুবে।'

'শিখিয়ে দিলে পারব।'

'আরেক যন্ত্রণা। তোমাকে কে শিখাবে ? আমি নিজেও তো জানি না। ইনস্ট্রাকসান ম্যানুয়েল কোথায় গেছে কে জানে।'

আমি বললাম, 'ধোপাখানায় কাপড় দিয়ে আসতে পারি।'

পল্টু সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, 'ভালো বুদ্ধি। গুড। ভেরি গুড। যাও কাজে লেগে পর।'

আমি কদমবুসি করে কাজে লেগে পড়লাম। কিডনী বিষয়ক জটিলতায় গেলাম না। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। পল্টু সাহেব অন্য একটা বই হাতে নিয়েছেন। বইটার নাম— The trouble with physics. লেখকের নাম Lee Smolin. কাজের ছেলে হিসেবে আমাকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর তিনি মনে হয় আমাকে মাথা থেকে পুরোপুরি দূর করে দিয়েছেন। আমার নামও ভুলে গেছেন। এ ধরনের মানুষরা কোনো কিছুই মনে রাখতে পারে না।

প্রথম চাকরি পেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের খবর দিতে হয়। মিষ্টি খাওয়াতে হয়। মৃত বাবা-মা'র কবর জিয়ারত করতে হয়। যারা দূরে বাস করে, চিঠি লিখে তাদের কাছ থেকে দোয়া নিতে হয়। বিশাল কর্মকাণ্ড। আমি বিশাল কর্মকাণ্ডের শুরুতে মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। আবেগ জর্জরিত গলায় বললাম, 'খালা আপনার দোয়া চাই। আজ চাকরিতে জয়েন করেছি।'

খালা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'চাকরিতে জয়েন করেছি মানে কি ? কি চাকরি ?'

'বাসাবাড়ির কাজ। সহজ বাংলায় চাকর। বেতন ভালো পেয়েছি— মাসে তিন হাজার। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঈদে বোনাস এবং কাপড়।'

'হড়বড় করে কি বলছিস ? গরমে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?'

'খালা, তুমি দু'একটা সহজ রান্না শিখিয়ে দিওতো। স্যারকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। হোটেলের রান্না খেয়ে স্যারের শরীর খারাপ হবে, এটা হতে দেয়া যায় না।'

'হাংকি পাংকি কথা বন্ধ করবি ? পল্টু ভাইজানের সঙ্গে দেখা করেছিস ?'

'করেছি। উনিই চাকরি দিলেন।'

খালা রাগি গলায় বললেন, 'তুই ভাইজানকে টেলিফোনটা দেতো। আমি উনার সঙ্গে কথা বলি।'

আমি বললাম, 'স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। উনি পড়াশোনা করছেন। আমার উপর ইনসট্রাকসান আছে— পড়াশোনার সময় যদি প্রেসিডেন্ট বুশও টেলিফোন করেন তাকে বলতে হবে— off যান। ইরাকে মানুষ মারা নিয়ে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেন। স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। স্যার ব্যস্ত।'

'ছাগলামী করবি না। এক্ষুণি ভাইজানকে টেলিফোন দে। আর শোন, তোকে কিডনী দিতে হবে না। তুই মানুষ হিসেবে বিষাক্ত। আমি চাই না তোর শরীরের কোনো অংশ ভাইজানের ভেতর থাকুক।'

'উনাকে বাঁচায়ে রাখতে হবে না ?'

'আমি অন্যখান থেকে কিডনী যোগাড় করব। বাংলাদেশে কিডনী পাওয়া কোনো ব্যাপার ? ষোল কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি কিডনী বিক্রির জন্যে কাস্টমার খুঁজছে। ভাইজানকে টেলিফোন দে।'

আমি লাইন কেটে দিলাম।

চাকরি প্রাপ্তির আনন্দ সংবাদ আর কাকে দেয়া যায়। অবশ্যই বাদলকে। সেও নতুন চাকরি পেয়েছে, কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়াচ্ছে। তার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে ডাকছে পগা স্যার। এটা নিয়ে সে মানসিক সমস্যায় আছে। পগা ডাকের পেছনের কারণ বের করতে পারছে না।

'কে, বাদল ?'

'হিমুদা তুমি ? আমি জানতাম আজ দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে।'

'চাকরি পেয়েছি এই খবরটা দেয়ার জন্যে টেলিফোন করলাম।'

'তুমি করবে চাকরি— কি বলছ এসব ? কোথায় চাকরি করছ ?'

'বাসার চাকর হিসেবে এক বাড়িতে দাখিল হয়ে গেছি। ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, হালকা রান্না— ডাল ভাত ডিম ভাজি।'

'সত্যি বলছ ?'

'অবশ্যই।'

==

বাদল মুগ্ধ গলায় বলল, 'আমার কাছে দারুণ একসাইটিং লাগছে। বাসা বাড়িতে কাজ নেয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। তোমাকে কেউ চিনুক বা না চিনুক, আমি চিনি। হিমুদা, কোথায় চাকরি করছ, কি করছ, একটু দেখে যাই?'

'আজ না, অন্য একদিন খবর দিয়ে নিয়ে আসব। নতুন চাকরিতো, বসের মেজাজ মর্জি বুঝে নেই। শুরুতেই আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে নিয়ে এলে বস রাগ করতে পারেন।'

'ঠিক আছে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেদিনই চলে আসব। আচ্ছা হিমুদা, আমাকে যে পগা স্যার ডাকে তার কারণ তোমাকে বের করতে বলেছিলাম, বের করেছ?'

'করেছি। ইংরেজি ইউনিভার্সিটিতো ছাত্ররা শুরুতে তোকে ডেকেছে হলি কাউ। সেখান থেকে হলি ডাংকি। পবিত্র গাধা। পবিত্র গাধা থেকে পগা।'

'বল কি?'

'বাদল, রাখলাম, স্যারের কিছু লাগে কি-না খোঁজ নিতে হবে।'

'তুমি কি সত্যি-সত্যিই বাসার চাকরের কাজ নিয়েছ?'

'ইয়েস।'

বাদল মুগ্ধ গলায় বলল, 'হাউ এক্সাইটিং। তোমাকে যতই দেখি ততই হিংসা হয়।'

আমি বললাম, 'বাদল, টেলিফোন রাখি, আমার স্যার এখন মুরগির মতো কক কক শব্দ করছে। ঘটনা কি দেখে আসি।'

'উনি মুরগির মতো কক কক করেন?'

'সব সময় করেন না। ইন্টারেস্টিং কোনো বই পড়ার সময় করেন।'

টেলিফোন রেখে বিনীত ভঙ্গিতে স্যারের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'কি ছুটি চাও?'

আমি বললাম, 'নাতো!'

'চাকরিতে জয়েন করেই সবাই ছুটি চায়। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে আসবে। বিছানা-বালিশ নিয়ে আসবে ইত্যাদি।'

'ছুটি চাই না। পায়ে বাতাস দিচ্ছেন কেন এটা জানতে চাই।'

স্যার উৎসাহিত হলেন। ছাত্রকে শেখাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'এরিস্টটলের নাম শুনেছ?'

'জ্বি না স্যার। আমি চাকর মানুষ। আমি আমার মতো চাকর-বাকরদের কিছু নাম জানি। উনার মতো বড় মানুষের নাম জানব কিভাবে?'

'উনি যে বড় মানুষ এই তথ্য তোমাকে কে দিল?'

===

'আন্দাজ করেছি। ইংরেজি নামতো, ইংরেজি নামের মানুষরা বড় মানুষ হয়।'

'কচু হয়। যাই হোক এরিস্টটল কোনো ইংরেজি নাম না। গ্রিক নাম। উনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। উনার ধারণা ছিল মানুষের মাথার একমাত্র কাজ এয়ার কন্ডিশনিং-এর মতো বডি কন্ডিশনিং। শরীরের তাপ ঠিক রাখা। যেহেতু এরিস্টটলের মতো বড় মানুষ এই কথা বলেছেন, সবাই ধরে নিল মাথার এইটাই একমাত্র কাজ। মাথার কাজ নিয়ে কেউ আর কোনো চিন্তাভাবনাই করল না। পরের এক হাজার বছর এরিস্টটলের কথাই বহাল রইল। এর থেকে কি প্রমাণিত হয় বল।'

'প্রমাণিত হয় বড় বিজ্ঞানীদের সব কথা শুনতে হয় না।'

'গুড। তোমার বুদ্ধি ভাল। একশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ।'

'স্যার, আপনার অসীম দয়া। কিন্তু পায়ে ফ্যানের বাতাসের ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার হয় নাই।'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমার ধারণা শরীরের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম হল পায়ে এবং কানে। খুব যখন ঠাণ্ডা পরে আমরা কি করি ? কান ঢাকি এবং পায়ে মোজা পরি। ঠিক কি-না বল।'

'জ্বি স্যার, ঠিক।'

'সেখান থেকে আমার ধারণা হয়েছে অতিরিক্ত গরমের সময় যদি পা এবং কান ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। সেই পরীক্ষাই করছি।'

'স্যার, ফলাফল কি ?'

'ফলাফল পজিটিভ। যদিও কান ঠাণ্ডা করার কোনো বুদ্ধি পাচ্ছি না। পা এবং কান দু'টাই একসঙ্গে ঠাণ্ডা করতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতাম।'

'কানে কি বরফ ঘসব স্যার? প্রতি দুই তিন মিনিট পর পর আপনার দুই কানে বরফ ঘসে দিলাম।'

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, 'অত্যন্ত ভাল বুদ্ধি। তোমার বেতন আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ালাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা।'

'স্যার, আপনার অসীম দয়া।'

'অসীম কি জান ?'

'জানি না স্যার। এইটুকু জানি, অসীম হল অনেক বেশি।'

'লেখাপড়া কিছু করেছ ?'

'অতি সামান্য।'

'লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহ আছে ? শিখতে চাও ?'

'শিখতে চাই না, স্যার।'

'কেন চাও না ?'

'এত জেনে কি হবে ? যত জ্ঞানই হোক মৃত্যুর পর সব শেষ। এই জন্যে ঠিক করে রেখেছি মানকের নকির এই দুই স্যারের কোশ্চেনের আনসার শুধু শিখে যাব ?'

পল্টু স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'এই দুইজন কে ?'

'স্যার, ফেরেশতা।'

'বল কি ? নাম শুনি নাইতো। উনারা কোশ্চেন করেন না-কি ?'

'কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। উত্তর না জানলে বিরাট সমস্যা।'

'কি প্রশ্ন বলতো ?'

যেমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে— 'তোমার প্রভু কে ?'

পল্টু স্যার হতভম্ব গলায় বললেন, 'খুবই কঠিন প্রশ্ন তো। আসলেই তো আমার প্রভু কে ? আমার প্রভু কি আমার সাব কনশাস মাইন্ড, নাকি আমার কনশাস মাইন্ড ? কে আমাকে কনট্রোল করে ?'

আমি বললাম, 'স্যার, এরচেয়েও কঠিন প্রশ্ন আছে। যেমন— তোমার ধর্ম কি ?'

পল্টু স্যার বললেন, 'সর্বনাশ! লোহার ধর্ম হল লোহা কঠিন। চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। মানুষের ধর্ম তাহলে কি ? জটিল চিন্তার বিষয় তো!'

পল্টু স্যার চোখ বুঁজে চিন্তা শুরু করলেন। তাঁর মুখ থেকে কক কক শব্দ বের হতে লাগল।

সাতদিনে আমার বেতন তিন হাজার টাকা থেকে বেড়ে বেড়ে হল চার হাজার পঞ্চাশ। এবং এই সাত দিনে পল্টু স্যার সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তার সামারি এবং সাবসটেন্স হচ্ছে—

ক. পল্টু স্যার অতি সজ্জন ব্যক্তি।
খ. পল্টু স্যার বেকুব ব্যক্তি।

ধরা যাক, কোনো এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হবে, আমি প্রতিবেদক। তাহলে আমি যা করব তা হচ্ছে— তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছেন এবং গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। এ রকম একটা ছবি তুলব লেখার সঙ্গে যাবার জন্যে। ছবির নিচের ক্যাপশানে— পাঠেই আনন্দ! মূল লেখাটা হবে এ রকম—

==

একজন নীরব জ্ঞান সাধক
(কক কক ধর্মী)

তাঁর ভাল নাম আবু হেনা। পরিচিতজনদের কাছে পল্টু ভাই কিংবা পল্টুভাইজান। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। চিরকুমার মানুষ। গুলশান এলাকার বত্রিশশ' স্কয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। ফ্ল্যাট বাড়ির আসবাব বলতে একটা শোয়ার খাট, একটা ইজিচেয়ার। বইকে যদি আসবাবের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে ইজিচেয়ার এবং খাট ছাড়া তাঁর আছে ছোট-বড় প্রায় দশ হাজার আসবাব। পড়ার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। হাতের কাছে যা পান তাই পড়েন। বই হাতে না থাকলে তাঁর বুক ধড়ফড় করে। হাঁপানির টান উঠে।

তিনি ঘুম থেকে উঠেন সকাল সাতটায়। এক কাপ চা একটা টোস্ট বিসকিট খেয়ে পড়তে শুরু করেন।

দুপুর একটায় গোসল করেন। দুপুরের খাবার খেয়ে ইজিচেয়ারে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে আবার পড়তে শুরু করেন। সন্ধ্যা ছটায় পড়া বন্ধ করে এক কাপ চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে। আবার পড়তে বসেন— রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা পড়ার কাজ চলে। এগারোটার পর রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে যান। রাত তিনটার দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে তাঁর ঘুম ভাঙে। এই সময়টাও তিনি নষ্ট করেন না। পড়াশোনা করেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট ৬ ইঞ্চি।
ওজন	:	ষাট কেজি (আনুমানিক)।
প্রিয় রঙ	:	কিছু নেই।
প্রিয় খাবার	:	সবই প্রিয়। যা দেয়া হয় তাই খান।
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	এই মুহূর্তে তাঁর গৃহভৃত্য হিমু।

==

মেডিকেল প্রোফাইল

ব্লাড গ্রুপ	:	A Positive.
কিডনী	:	দু'টাই অকেজো।
প্রেসার	:	নরমাল।
ডায়াবেটিস	:	নাই।
কলেস্টরেল	:	বিপদসীমার নিচে।

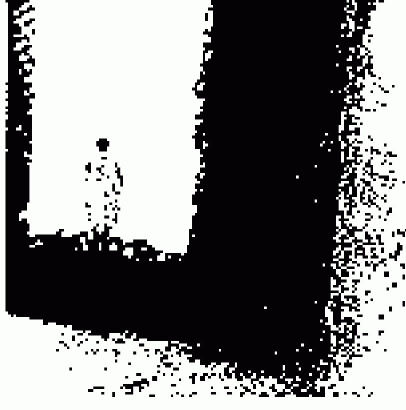
অর্থনৈতিক প্রোফাইল

নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকেন। এ ছাড়াও কয়েকটি ফ্ল্যাট আছে। সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। ব্যাংকে প্রচুর টাকা। তিনি চেক কেটে টাকা তুলতে পারেন না, কারণ সিগনেচার মিলে না। পল্টু স্যার যে সিগনেচারে একাউন্ড খুলেছেন সেটা ভুলে গেছেন। বাড়ি ভাড়ার নগদ টাকা যা আসে তাতেই সংসার চলে। বাসায় বড় একটা লকার আছে। লকারের কম্বিনেশন নাম্বার স্যার ভুলে গেছেন বলে লকার খোলা যাচ্ছে না। স্যার প্রতি শুক্রবারে আধঘণ্টা সময় বিভিন্ন নাম্বারে চেষ্টা করেন। তাতে লাভ হচ্ছে না।

কক কক ধর্ম

বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। কিছু কিছু বই পড়ার সময় তিনি কক কক জাতীয় শব্দ করেন। পছন্দের বই হলে এ ধরনের শব্দ করেন, না-কি অপছন্দের বই হলে করেন—তা এখনো বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কক কক শব্দটার সঙ্গে মুরগির ডাকের সাদৃশ্য আছে।

==



গৃহভৃত্য বিষয়ে আমার বাবার কিছু উপদেশবাণী ছিল। উপদেশবাণীর সার অংশ হচ্ছে— "মহাপুরুষদের কিছুকাল গৃহভৃত্য হিসেবে থাকতে হবে।" তিনি ডায়েরিতে কি লিখে গেছেন হুবহু তুলে দিচ্ছি। এই অংশটি তিনি মৃত্যুর আগে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে লিখেছেন। হাতের লেখা জড়ানো এবং অস্পষ্ট। মানুষের মানসিক অবস্থার ছাপ পড়ে হাতের লেখায়। আমার ধারণা তখন তাঁর মানসিক অবস্থাও ছিল এলোমেলো। লেখার শিরোনাম— হিজ মাস্টার্স ভয়েস। তিনি সব লেখাই সাধু ভাষায় লেখেন। এই প্রথম সাধু ভাষা বাদ দিয়ে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

হিমু, তুমি নিশ্চয় রেকর্ড কোম্পানি— হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড দেখেছ। তাদের মনোগ্রামে একটি কুকুরের ছবি আছে। কুকুরটা থাবা গেড়ে তার মনিবের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে প্রভুর প্রতি আনুগত্য ঝরে ঝরে পড়ছে।

সব মহাপুরুষদের কিছু দিন কুকুর জীবন যাপন করা বাধ্যতামূলক। সে একজন প্রভুর অধীনে থাকবে। প্রভুর কথাই হবে তার কথা। প্রভুর আদেশ পালনেই তার জীবনের সার্থকতা। প্রভুর ভাবনাই হবে তার ভাবনা। প্রভু মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাই সে সত্য বলে ধরে নিবে।

কুকুর ট্রেনিং-এ উপকার যা হবে তা নিম্নরূপ :

ক. জীবনে বিনয় আসবে। বিনয় নামক এই মহৎ গুণটি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমি অতি বিনয়ী মানুষকেও দেখেছি অহংকারের গুদাম। সেই গুদাম তালাবদ্ধ থাকে বলে কেউ তার অহংকার প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

খ. 'আনুগত্য' কি তা শেখা যাবে। প্রতিটি মানুষ নিজের প্রতিই শুধু অনুগত। অন্যের প্রতি নয়। নিজের প্রতি আনুগত্য যে সর্বজনে ছড়িয়ে দিতে পারবে সেইতো মহামানব।

==

গ. মানুষকে সেবা করার প্রথম পাঠের শুরু।

কুকুর ট্রেনিং কিংবা গৃহভৃত্য ট্রেনিং তোমাকে সেবা নামক আরেকটি মহৎ গুণের সংস্পর্শে আনবে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল না, তোমাকে সত্যি সেবা শিখতে হবে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল অসুস্থ মানুষদের সেবা করতেন। তারা এমনিতেই সেবার দাবিদার। তোমাকে সুস্থ মানুষকে সেবা করতে হবে।

আমি নিজে এখন অসুস্থ। সময় ঘনিয়ে আসছে এরূপ মনে হয়। তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং দিয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। যেসব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব না, আমার আদেশ, সেসব শিক্ষা নিজে নিজে গ্রহণ করবে।

এখন অন্য বিষয়ে কিছু কথা বলি— গত পরশু দুপুরে আমি তোমার মা'কে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন মস্তিষ্ক তার স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করে। যাচাই-বাছাই করে, কিছু পুনর্বিন্যাস করে, তারপর স্মৃতির ফাইলে যত্ন করে রেখে দেয়। এই কাজটা সে করে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন। মস্তিষ্কের এই কাজ-কর্মই আমাদের কাছে ধরা দেয় স্বপ্ন হিসেবে। ফ্রয়েড সাহেব বলেছেন, সব স্বপ্নের মূলে আছে যৌনতা। এই ধারণা যে কতটা ভুল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, এখন স্বপ্নের কথা বলি। আমি তোমার কিশোরী মা'কে স্বপ্নে দেখলাম। এটা কীভাবে সম্ভব হল জানি না। কারণ তাকে আমি কিশোরী অবস্থায় কখনো দেখি নাই। যখন তাকে বিবাহ করি তখন তার বয়স বাইশ। সে একজন তরুণী।

আমি দেখলাম সে তার গ্রামের বাড়িতে। কুয়ার পাড়ে বসে আছে। তার সামনে এক বালতি পানি। সে চোখেমুখে পানি দিচ্ছে। তোমার মা অতি রূপবতীদের একজন— এই তথ্য মনে হয় তুমি জান না। কারণ, তার মৃত্যুর পর আমি তার সমস্ত ফটোগ্রাফ নষ্ট করে দিয়েছি। তার স্মৃতি জড়িত সব কিছুই ফেলে দেয়া হয়েছে। কারণ স্মৃতি মানুষকে পিছনে টেনে ধরে। মহাপুরুষদের পিছুটান থেকে মুক্ত থাকতে হয়।

স্বপ্নের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তোমার মা চোখেমুখে পানি দিয়ে উঠে দাঁড়ানো মাত্র আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তোমার মা অত্যন্ত আনন্দিত গলায় বলল, 'তুমি একা এসেছ, আমার ছেলে কই?'

আমি বললাম, 'তাকে ঢাকা শহরে রেখে এসেছি।'

সে করুণ গলায় বলল, 'আহারে, কত দিন তাকে দেখি না! সে না-কি হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'তুমি তাকে সুন্দর একটা শার্ট কিনে দিও। একটা প্যান্ট কিনে দিও। এক জোড়া জুতা কিনে দিও।'

'আচ্ছা দিব।'

তোমার মা তখন কাঁদতে শুরু করে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওর কি কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে ? কোনো মেয়ে কি ভালোবেসে তার হাত ধরেছে ?'

আমি বললাম, 'না। সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে। তার জন্যে নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ।'

তোমার মা চোখের পানি মুছে রাগী রাগী গলায় বলল, 'সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে, না কচু করছে। তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। আমি থাবড়ায়ে তার মহাপুরুষগিরি ছুটায়ে দিব।'

স্বপ্নের এই জায়গায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্ন যে এক ধরনের ভ্রান্তি তা আমি জানি। তারপরেও স্বপ্নদর্শনের পর পর আমার মধ্যে কিছু আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল। আমার চক্ষু সজল হল। মনে মনে বললাম,

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি
অরণ্যং তেন গন্তব্যং
যথারণ্যং তথা গৃহম।

'বাবা হিমু, এখন তোমাকে একটি বিশেষ কথা বলি— তোমার মায়ের একটি আট ইঞ্চি বাই বার ইঞ্চি ছবি এবং তার লেখা ডায়েরি আকারে একটা খাতা আমি গোপনে রেখে দিয়েছি। একটা খামে সিলগালা করে রাখা। যে তোষকে আমি ঘুমাই সেই তোষকের ভেতরে সিলাই করে রাখা আছে। তুমি খামটি সংগ্রহ করবে। যে দিন কোনো কারণে তোমার হৃদয় সত্যিকার অর্থেই আনন্দে পূর্ণ হবে সেদিন খামটা খুলবে। তবে একবার খাম খুলে ফেলার পর ছবি, খাতা এবং খাম আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেহেতু একবার দেখার পর সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে সেই কারণেই তুমি কোনোদিন খামটা খুলতে পারবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হা হা হা। একে কি বলে জান ? একে বলে থেকেও নাই।'

বাবার উপদেশ মেনে এক মাস গৃহভৃত্যের কাজ করে আজ বেতন পেয়েছি। পল্টু স্যার সারাদিনের ছুটি দিয়েছেন। আজ তার ডায়ালাইসিসের দিন। সারাদিন কাটাবেন হাসপাতালে। রাতে ফিরবেন, আবার নাও ফিরতে

পারেন। শরীর বেশি খারাপ লাগলে হাসপাতালেই থেকে যাবেন। তাঁর অবস্থা দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ডাক্তাররা 'কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই' এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

পল্টু স্যার বলেছেন, অন্যের কিডনী শরীরে নিয়ে বাঁচার তিনি কোনোই কারণ দেখছেন না। তাঁর মতে ঘুম যেমন ভয়াবহ কিছু না, মৃত্যুও না। বরং ঘুমের চেয়ে ভালো। ঘুম এক সময় ভাঙে, বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। গরম, ঘাম, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা, বাথরুম নামক অসুবিধায় বাস করতে হয়। মৃত্যুতে এই সমস্যা নেই। তাঁর একটাই সমস্যা— মৃত্যুর পর বইগুলো সঙ্গে থাকবে না।

অনেকদিন পর রাস্তায় হাঁটছি। গরমটা ভালো লাগছে, গায়ের ঘামের গন্ধও ভালো লাগছে। কঠিন রোদের আলাদা মজা আছে।

এফডিসির কাছের রেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন যাবে সেই দৃশ্য দেখব। ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে মনের একটা অংশও ছুটে যায়, সেই অনুভূতি অন্য রকম। ট্রেন কখন আসবে জানি না। অপেক্ষা করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। হাতে রাত আটটা পর্যন্ত সময়। আমি আগ্রহ নিয়ে চারপাশ দেখছি। একটা রিকশায় মায়াকাড়া চেহারার শ্যামলা মেয়ে বসে আছে। বৈশাখের দুর্দান্ত রোদেও মেয়েটা রিকশার হুড তোলেনি। রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। মেয়েটাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে কাঁদতে কাঁদতে এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে আসছে। প্রকৃতি মানুষের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদবে, তার চোখে পানি আসবে এবং আনন্দ পেলে সে হাসবে, তার দাঁত দেখা যাবে— এই ব্যবস্থা। প্রকৃতি এই কাজটা কেন করল ?

আমার ধারণা প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করেছে যেন মানুষ তার দুঃখ এবং আনন্দ লুকাতে না পারে। যেন অন্যরা টের পেয়ে যায়। দুঃখ এবং আনন্দ ভাগ করার জন্যে এগিয়ে আসে।

রেল ক্রসিং-এর গেট পরে গেছে। মেয়েটার রিকশা থেমে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি রিকশার দিকে। আমার হঠাৎ মনে হল— রিকশার ভাড়া দেবার মতো টাকা মেয়েটার কাছে নেই। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা ভয়াবহ ক্ষুধার্ত। রাতে সে কিছু খায় নি। এত বেলা হয়েছে এখনো কিছু খায় নি।

মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে পড়েছে। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে কি যেন বলছে। মেয়েটার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। সে হতাশ ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম, 'ভাড়া কত হয়েছে ?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'একশ টাকা।'

===

আমি বললাম, 'ঢাকা শহরে রিকশার ভাড়া একশ টাকা এই প্রথম শুনলাম।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'স্যার, আমি ইনারে নিয়া সকাল থাইকা ঘুরতাছি। এর বাড়িতে যায়, তার বাড়িতে যায়। কানতে কানতে ফিরা আসে, যাত্রাবাড়ি গেলাম। মগবাজার গেলাম। রামপুরা গেলাম— এখন আপনি বিবেচনা করেন। একশ টাকা কমই চাইছি।'

আমি বললাম, 'আমারো তাই ধারণা। এই নাও রিকশা ভাড়া একশ টাকা। আর এই নাও বিশ টাকা। বরফ দেয়া লাচ্ছি খাও। গরমে আরাম হবে।'

রিকশাওয়ালা এই প্রথম ভালোভাবে আমার দিকে তাকালো এবং জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল, 'হিমু ভাই, মাফ দেন। আপনেরে চিনতে পারি নাই।' সে নিচু হয়ে কদমবুসি করল।

মেয়েটা হতভম্ব। আশেপাশের লোকজনও কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ট্রেন এসে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি ট্রেনের দিকে—

বৃষ্টি দেখলেই যেমন ছেলেবেলার গান 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' মনে পড়ে, ট্রেন দেখলেই ট্রেনের ছড়া মনে পড়ে—

রেল গাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম
ইস্টিশনের মিষ্টি কুল
শখের বাগান গোলাপ ফুল।

ট্রেন চলে গেছে। রেল গেটের জটলা শেষ। শুধু আমি, মায়াবতী তরুণী এবং রিকশাওয়ালা আটকে আছি।

রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে বলল, 'হিমু ভাই কি আমারে চিনেছেন? আমি ছামছু। আমার মেয়ের নাম সাগরিকা। আপনার কারণে মেয়েটার জীবন রক্ষা হয়েছিল। চিনেছেন হিমু ভাই?'

'হুঁ।'

'একটা পরীক্ষা আছে না, পাস করলে মাসে মাসে টেকা পায়। সাগরিকা সেই পরীক্ষা পাস করছে। টেকা পাওয়া শুরু করছে। এইটা সেইটা কিনতে চায়। আমি বলেছি, খবরদার! আগে হিমু ভাইরে পছন্দের কিছু কিন্যা দিবি। তারপর অন্য কথা। ঠিক বলেছি না?'

'হুঁ।'

===

'এখন বলেন আপনার পছন্দের জিনিস কি ? আইজই কিনব।'

'চিন্তা-ভাবনা করে বলি। হুট করে বলতে পারব না। আগে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ক্ষুধায় জীবন যাওয়ার উপক্রম। ঢাকা শহরের সবচে ভালো মোরগ-পোলাও কোথায় পাওয়া যাবে ?'

'পুরান ঢাকায় যাইতে হবে। সাইনি পালোয়ান।'

'চল যাই।'

আমি রিকশায় উঠে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চল, মোরগ-পোলাও খেয়ে আসি।'

মেয়েটা চোখ-মুখ খিচিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'আপনি আমাকে মোরগ-পোলাও খাওয়াবেন কেন ?'

আমি বললাম, 'তোমার ক্ষিধে লেগেছে এই জন্যে।'

মেয়েটি গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, 'আমার ক্ষিধে লাগলে আপনি কেন আমাকে খাওয়াবেন ?'

আমি বললাম, 'ঝামেলা করবে না। সারাদিন রিকশা নিয়ে ঘুরেছ, ভাড়া দিতে পার নি, আবার ঝগড়া। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি রিকশায় না উঠ তিনটা থাপ্পর দিয়ে চলে যাব। এক... দুই...

তিন বলার আগেই মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালা বলল, 'আপনেরে চিনে নাই, এই জন্য ভং করছে। চিনলে লাফ দিয়ে কোলে উইঠ্যা বসত।'

আমি বললাম, 'তোমার ঐ দোকানে আইটেম আর কি পাওয়া যায় ?'

রিকশাওয়ালা মহানন্দে রিকশার প্যাডেল চাপতে চাপতে বলল, 'গ্লাসি পাইবেন। খাসির মাংস দিয়া বানায়। এমন গ্লাসি আপনে বেহেশতেও পাইবেন না।'

'মোরগ-পোলাওয়ের সঙ্গে গ্লাসি যায় ?'

'অবশ্যই যায়। কেন যাইব না ? চ্যালচ্যালায় যায়।'

'ঠিক আছে, মোরগ পোলাও এবং গ্লাসি সাথে আর কি ?'

'কোয়েল পাখির রোস্ট খাইবেন ? পেটের ভিতরে থাকবে পাখির ডিম।'

'অবশ্যই খাব।'

'দাম আছে কিন্তু।'

'দাম কোনো বিষয়ই না। একদিনইতো খাব। রোজ রোজ তো খাচ্ছি না।'

মেয়েটা শক্ত হয়ে বসে আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুটা দিশেহারা। তার হাতের আঙুল কাঁপছে। খুব সম্ভব টেনশান এবং ক্ষুধার কারণে।

==

'তোমার নাম কি ?'

'আমার নাম জেনে কি করবেন ?'

'আমি একজনকে মোরগ-পোলাও, গ্লাসি এবং ডিমসহ কোয়েল পাখি খাওয়াবো, তার নাম জানব না ?'

'আমার নাম রানু।'

'থাক কোথায় ?'

'মহিলা হোস্টেলে। হাতিরপুলের কাছে।'

'মহিলা হোস্টেলে কত টাকা বাকি পড়েছে ? আমার ধারণা মহিলা হোস্টেলের বাকি শোধ করার জন্যেই তুমি ঘুরছ। টাকা জমা দেবার আজই কি শেষ দিন ?'

রানু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি জেনে কি করবেন ? আমাকে টাকাটা দিবেন ?'

'হুঁ। দেব।'

'বিনিময়ে আমাকে কি করতে হবে ? আপনার সঙ্গে শুতে হবে ?'

আমি কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

রানু এখন মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ রক্তবর্ণ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি বললাম, রানু শোন। তুমি ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছ। সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে টাকা রোজগারের চিন্তা করছ বলেই আমাকে এমন কুৎসিত কথা বলতে পারলে।

রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'সরি।'

'আমি তোমাকে একটা ঠিকানা লিখে দেব। এই ঠিকানায় চলে এসো, দেখি কোনো চাকরি দেয়া যায় কি-না।'

'আমার জন্যে আপনাকে কিছু করতে হবে না।'

'আচ্ছা যাও— কিছু করব না।'

'হোস্টেলের টাকাটা আপনার কাছ থেকে ধার হিসেবে নেব। যথা সময়ে ফেরত দেব। আমার তিন হাজার টাকা লাগবে। তিন হাজার টাকা কি আছে আপনার সঙ্গে ?'

'আছে।'

'আরেকটা কথা আপনাকে বলি— আপনি নিজেকে যতটা ভালো মানুষ প্রমাণ করতে চাইছেন ততটা ভালো মানুষ আপনি নন।'

'কিভাবে বুঝলে ?'

===

'আমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি। সে ভালো না মন্দ।'

'কখন থেকে পার? ছোটবেলা থেকে?'

রানু জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। তার শরীরের কাঁপুনি থেকে বুঝতে পারছি সে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'টাকাটা যে আমাকে ফেরত দেবে। কিভাবে দেবে? তোমার ভাবভঙ্গি পরিষ্কার বলছে তুমি গভীর জলে পড়েছ। কারো কাছ থেকে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?'

'আপনার টাকা পেলেইতো হল। কোত্থেকে পাচ্ছি সেটা জেনে কি করবেন? যাই হোক আপনাকে বলছি— আমি কিডনী বিক্রি করছি। এক ভদ্রলোক কিনবেন বলে কথা পাকা হয়েছে। ক্রস ম্যাচিং আরো কি কি যেন আছে, সব করা হয়েছে।'

'কত টাকায় বিক্রি করছ?'

'এক লাখ টাকা। যে এজেন্ট বিক্রির ব্যবস্থা করেছে তাকে দশ হাজার দিতে হবে। আমি পাব নব্বই হাজার।'

'নব্বই হাজারে কিডনী খারাপ না। টাকাটা হাতে পাচ্ছ কবে?'

'এই মাসের আঠারো তারিখ অর্ধেক টাকা পাব। বাকি অর্ধেক ট্রান্সপ্লান্টের পরে।'

'যিনি তোমার কিডনী কিনছেন তার নাম জান?'

রানু বলল, 'কার জন্যে কিডনী কেনা হচ্ছে তা আমি জানি না। মাজেদা বলে একজন মহিলা সব ব্যবস্থা করছেন। নিউ ইস্কাটনে থাকেন।'

আমি বললাম, 'হলি কাউ। পবিত্র গাভী।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'গাভীর কথা কি বললেন স্যার?'

'গাভীর কথা কিছু বলি নাই। তুমি রিকশা চালাও।'

রানু খাওয়া-দাওয়ায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল, 'আমি একটা মিষ্টিপান খাব।' তার চোখে চকচকে ভাব আগে ছিল না, এখন চলে এসেছে। তাকে পান কিনে দেয়া হল। সে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, 'আমি এম্নিতে পান খাই না। শুধু বিয়েবাড়িতে গেলে পান খাই। একবার জর্দা দেয়া পান খেয়ে বিয়েবাড়িতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বান্ধবীর বিয়ে। ওর নাম হাসি। আমরা ওকে ক্ষেপানোর জন্যে বলতাম—

হাসি।
রজব আলির খাসি।'

'রজব আলিটা কে?'

==

'রজব আলি কেউ না। এম্নি একটা নাম। মজার ব্যাপার কি জানেন ? ওর বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছে তার নাম রজব আলি। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ম্যানেজার। অদ্ভুত না ?'

'কিছুটা অদ্ভুত।'

রানু বলল, 'মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আজ যেমন ঘটেছে। যখন খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে হল আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আজকের তারিখটা জানেন ?'

'সতেরোই মে।'

'আজ আমার বাবার মৃত্যু দিন। উনি মারা গিয়েছিলেন দুপুর দু'টায়। আমি যখন খাওয়া শুরু করি তখন বাজে দুপুর দু'টা। আমি ঘড়ি দেখেছিলামতো, আমি জানি। খাবার সময় আমি যে কাঁদছিলাম আপনি দেখেছেন ? প্লেটে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি পড়েছিল।'

'দেখেছি।'

'কাঁদছিলাম, কারণ আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, আমার বাবা ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন— মা! আরাম করে ভাত খা। খাওয়ার সময় প্লেটে চোখের পানি ফেলতে নেই। এ রকম কেন মনে হল শুনতে চান ?'

'চাই।'

'আরেক দিন বলব। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা, বলুনতো, আমি কি দেখতে খারাপ ?'

'খারাপ না, তবে রসগোল্লাও না।'

'কিছু একটা আমার মধ্যে আছে। ভয়ংকর রিপালসিভ কিছু। এখন পর্যন্ত কোনো ছেলে আমার প্রেমে পড়ে নি। অথচ প্রতিরাতে ঘুমুতে যাবার সময় আমি চিন্তা করি— একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে আমার মন ভুলাবার জন্যে হাস্যকর সব কাণ্ডকারখানা করছে।'

'কি রকম হাস্যকর কাণ্ডকারখানা ?'

'একেক রাতে একেক রকম ভাবি। কাল রাতে ভেবেছি— একটা ছেলে ব্লেড নিয়ে আমার ঘরের বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে— তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হও, তাহলে আমি ব্লেড দিয়ে আমার হাতের শিরা কেটে ফেলব।'

'তুমি রাজি হয়েছ ?'

'অবশ্যই রাজি হব! যে কোনো ছেলে এই ধরনের কথা বললে আমি রাজি হব।'

'না, তা হবে না। রিকশাওয়ালা ছামছু বললে রাজি হবে না।'

রানু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'রিকশাওয়ালাকে আপনি টেনে আনলেন কেন ? আপনিতো অদ্ভুত মানুষ।'

আমি বললাম, 'তুমি যখন রাজি হলে তখন ছেলেটা কি করল ?'

রানু বলল, 'আপনাকে আর কিছুই বলব না। এতক্ষণ বক বক করেছি বলে নিজের উপর রাগ লাগছে। আমি আপনার সঙ্গে ফেরত যাব না। আলাদা রিকশা নিয়ে যাব।'

'তাহলে বিদায়।'

রানু বলল, 'বিদায়। আপনি আমাকে যত্ন করে খাইয়েছেন, কোন একদিন সেটা আমি শোধ করব। যত তাড়াতাড়ি পারি করব। প্রমিজ।'

রানু চলে গেল। আমিও রওনা হলাম। হাতে অনেক সময়। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করা দরকার। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করার পর হাসপাতালে চলে যাব। দেখে আসব পল্টু স্যারকে। হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, কারণ হাত খালি। টাকা যা ছিল রানুকে দিয়ে দিয়েছি। তিন হাজার টাকা দেবার কথা। তারচে বেশিই দিয়েছি। কত বেশি বুঝতে পারছি না।

ভরপেট খাওয়ার পর কড়া রোদে হাঁটার অন্য রকম মজা আছে। মনে হয় নেশা করে হাঁটছি। ছাতিম গাছের ফুলের গন্ধ শুঁকলে যে রকম নেশা হয় সে রকম নেশা।

মাজেদা খালা দরজা খুলে বললেন, তোর একি অবস্থা ? মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে গোসল করেছিস। এক্ষুণি বাথরুমে ঢুকে পর। সাবান ডলে গোসল দে। তার আগে লেবুর সরবত করে দিচ্ছি। সরবত খা। ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে থাক, শরীর ঠাণ্ডা হোক।

আমি ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে লাগলাম। মাজেদা খালা ঘরের এসিও ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর দ্রুত শীতল হচ্ছে। রোদে হাঁটার নেশা ভাবটা কেটে যাচ্ছে।

মাজেদ খালা সরবত নিয়ে এলেন। চিনির সরবত না, লবণের সরবত। প্রচুর ঘাম হলে এই সরবতই না-কি খাবার বিধান।

'তুই কি আমার কাছে কোনো কাজে এসেছিস ?'

'হুঁ।'

'আমারো তাই ধারণা। ভর দুপুরে বিনা কাজে আসার মানুষ তুই না। কাজটা কি ?'

==

'বিশেষ একটা ধর্ম নিয়ে আমি গবেষণা করছি। তুমি এই বিষয়ে কি জান তাই জানতে এসেছি।'

'ধর্ম বিষয়ে আমি কি জানব। তোর খালু সাহেব জানতে পারেন। সে দেশে নেই। জাপান গিয়েছে।'

'তুমি যা জান তাই শুনি।'

'কি ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাস?'

'কক কক ধর্ম।'

'কক কক ধর্ম আবার কি ? এই প্রথম এমন এক ধর্মের নাম শুনলাম।'

'পল্টু স্যার যে কক কক শব্দ করে এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।'

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সহজ কথা সহজে বলতে পারিস না? আমি ভাবলাম কি-না কি ধর্ম।'

'আমি যতদূর জানি কক কক করার কারণে স্যারের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি ?'

মাজেদা খালা বললেন, 'তোকে কে বলেছে ? পল্টু ভাইজান বলেছেন ?'

'হুঁ। স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার বিয়ে করেন নি কেন ? তখন বললেন।'

মাজেদা খালা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল, সেটা কি বলেছে ?'

'না।'

'যাক, 'এইটুকু সেন্স তাহলে আছে।'

'তোমার সঙ্গেই বিয়ে হতে যাচ্ছিল ?'

'হুঁ। বিরাট বড়লোকের ছেলে, গাড়ি-বাড়ি এই সব দেখে বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আর আমি নিজেও তাকে পছন্দ করতাম। পছন্দ করার মতোই মানুষ। বিয়ে করতে এসেছে। বরযাত্রীর সঙ্গে বসেছে। টেনশনের কারণে মনে হয় কিছু একটা হয়েছে— শুরু করল কক কক।

আমার বড় চাচা মিলিটারি কর্নেল। তিনি বললেন, জামাই কক কক শব্দ করছে কেন ? সমস্যা কি ?

পল্টু ভাইজান বড় চাচার হুংকারে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। জোড়ে জোড়ে কক কক করতে লাগলেন। এত জোড়ে যে, ভেতর বাড়ি থেকে শুনা যায়। বিয়ে ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'পল্টু স্যারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খারাপ হতো না। মানুষটা শুধু যে ভাল তা-না। অন্য রকম ভাল।'

মাজেদা খালা চাপা গলায় বললেন, 'জানি।'

==

আমি বললাম, 'উনার শোবার ঘরে তোমার যে একটা বাঁধানো ছবি আছে এটা কি জান ?'

'নাতো!'

'বয়সকালে তুমি যে কি রূপবতী ছিলে ছবিটা না দেখলে বিশ্বাস করাই মুশকিল। প্রথম কিছুদিন আমি চিনতেই পারিনি যে এটা তোমার ছবি।'

মাজেদা খালা বললেন, 'তোর দায়িত্ব হচ্ছে আজই ছবিটা সরিয়ে ফেলা। অন্য লোকের স্ত্রীর ছবি তিনি কেন নিজের ঘরে রাখবেন। ছিঃ! আজ দিনের মধ্যে তুই ছবি সরাবি।'

আমি বললাম, 'এই কাজটা আমি করব না, খালা। বেচারার কিছুইতো নেই। থাকুক না একটা ছবি।'

মাজেদা খালা চট করে আমার সামনে থেকে সরে গেলেন। বুঝতে পারছি হঠাৎ তার চোখে পানি চলে এসেছে। প্রকৃতি মাঝে মাঝে মানুষকে এমন বিপদে ফেলে। চোখে পানি আসার সিস্টেম না থাকলে জীবন যাপন হয়তো সহজ হতো।

==



হাসপাতালের ৩১ নম্বর কেবিনে পল্টু স্যার হতাশ ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে হাসপাতালের হাস্যকর সবুজ জামা। এই জামায় রোগীর সুবিধার জন্যে বোতাম থাকে না। পেছন দিকে ফিতা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেই ফিতা বাঁধতে হয় বলে বেশির ভাগ সময় আন্ধাগিট্টু লেগে যায়। প্রয়োজনের সময় এই জামা খোলা যায় না। রোগীতো পারেই না, নার্সরাও পারে না।

পল্টু স্যারের হাতে টিভির রিমোট কনট্রল। তিনি তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। টিভি কিন্তু বন্ধ। ফিনাইল গন্ধমুক্ত হোটেলধর্মী হাসপাতাল। ইদানীং এই ধরনের হাসপাতাল বাংলাদেশে প্রচুর হচ্ছে। এই হাসপাতালগুলোর লক্ষ্য রোগীকে ফাইভ স্টার হোটেলের আনন্দে রাখা। চিকিৎসা অনেক পরের ব্যাপার। সমস্যা হচ্ছে রোগীরা চাচ্ছে চিকিৎসা। ফাইভ স্টার হোটেলে আরামে থাকতে চাইলে তারা ফাইভ স্টার হোটেলেই যেত। হাসপাতালে ভর্তি হতো না।

'স্যার! টিভিতে কি দেখছেন ?'

পল্টু স্যার চমকে আমার দিকে তাকিয়েই হাহাকার ধ্বনি করলেন, 'হিমালয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। মহাসর্বনাশ।'

'কি সর্বনাশ হয়েছে ?'

'হাসপাতালে পড়ার জন্যে একটা প্যাকেটে বই আলাদা করে রেখেছিলাম। প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। বই ছাড়া রাত কাটাবো কিভাবে ?'

'আমার ঝুলির ভেতর একটা গল্পের বই আছে। এতে কাজ চলবে ?'

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, 'অবশ্যই কাজ চলবে। আমার বই হলেই চলে। কি বই সেটা কোনো ব্যাপার না।'

স্যার, আমি যে বইটা এনেছি তার নাম 'বিড়াল আমার সিমকার্ড দুধে ভিজিয়ে খেয়ে ফেলেছিল।' অতি আধুনিক লেখা।

পল্টু স্যার বললেন, 'সিমকার্ড বিড়াল দুধে ভিজিয়ে কিভাবে খাবে ? কার্ডটা ধরবে কিভাবে ? থাবা দিয়েতো কিছু ধরা যায় না।'

'বিড়াল দাঁতে কামড় দিয়ে কার্ড ধরেছিল। সেই ভাবেই দুধের বাটিতে ডুবিয়েছে।'

পল্টু স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বিড়াল সিগ্নকার্ড খায় এটাই জানতাম না। ছাগল সব কিছু খায় এটা জানি— আচ্ছা শোন, এটা কি হাসির বই ?'

'হাসির বই না, স্যার। খুব সিরিয়াস বই। পরাবাস্তবতা।'

পল্টু স্যার বললেন, 'অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমার সমস্যা নাই। শুধু হাসির ব্যাপারগুলো নিয়ে সমস্যা। একটা জোকস-এর বই অনেক দিন আগে পড়েছিলাম— কিছুই বুঝতে পারি নাই। তোমাকে একটা বলব ? তুমি কিছু বুঝতে পার কি-না।'

'বলুন।'

'এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। প্রেমিকা ব্যাক ভিউ মিরর দেখিয়ে বলল, আয়নাটা এমনভাবে ফিট করেছে যে, মুখ দেখা যায় না। চুল ঠিক করতে পারছি না।' প্রেমিক বলল, 'ঐ আয়নাটা পেছন দেখার জন্যে।' তখন প্রেমিকা বলল, 'ছিঃ ছিঃ কমল ভাই। আপনি এত অসভ্য কেন ?' এই হল গল্প বুঝলে। এখন তুমি বল, ছেলেটা অসভ্যতা কি করেছে ? সত্যি কথা বলার মধ্যে কোনো অসভ্যতা আছে ?'

'জ্বি না।'

'আমি গল্পটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিছুই বের করতে পারি নাই। আচ্ছা শোন, এমন কি হতে পারে যে প্রেমিক গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে এটাই হাসির ব্যাপার ?'

'হতে পারে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। মেয়েটা গাড়ি চালানো শিখবে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে। কিংবা তাদের বাসার ড্রাইভারের কাছে। প্রেমিকের কাছে কেন ?'

'যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন, স্যার।'

'তারপরেও মেয়েটার আচরণ ঠিক না। সে ছিঃ ছিঃ করে উঠবে কেন ? অবশ্যি মেয়েটার মেজাজ খারাপ। সে মুখ দেখতে পারছে না। মাথার চুল ঠিক করতে পারছে না। মেজাজ খারাপের কারণে সে ছিঃ ছিঃ বলেছে।'

'স্যার, হতে পারে। আপনি বরং বই পড়ুন। কিংবা ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আজ আপনার শরীর খারাপ।'

'ঠিকই বলেছ। চোখ জ্বালা করছে। তুমি বইটা পড়ে শুনাও।'

আমি বই হাতে নিলাম। পল্টু স্যার আধশোয়া হয়ে আছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে পরাবাস্তব গল্প শুনছেন। তাঁর চোখে শিশুর মুগ্ধতা।

==

বিড়ালটা নাদুস নুদুস কিন্তু অন্ধ। তার জগৎ ধূসর। তার চোখ পিটপিট করে, কিন্তু সে দেখে না। তার সামনে দুধের বাটি। বাটিতে দুধ নেই। কিংবা ছিল, দুষ্ট বিড়াল দেখতে পায় নি। কারণ সে অন্ধ। প্রথম তার যখন চোখ ফুটল, তখন তার মা বলল, 'ডার্লিং, দেখ কি সুন্দর পৃথিবী!' সে পৃথিবী দেখে বিরক্ত হল, কি কুৎসিত তখন সে নিজে নিজে অন্ধ হয়ে গেল। যে চোখে দেখে না, সে কথা বেশি বলে। বিড়ালের মা তাকে একটা গ্রামীণ মোবাইল সেট উপহার দিল। সেখানে কোনো সিমকার্ড ছিল না।

সে সিমকার্ড কিনতে গ্রামীণের সেলস সেন্টারে গেল।

সেলস সেন্টারের পরিচালক একজন তরুণী। তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বৃশ্চিক রাশির জাতক। আজ তাড়াহুড়া করে এসেছেন বলে শাড়ি পরে আসতে পারেন নি। তার সুগঠিত স্তন ভোরের আলোয় ঝলমল করছে। তার স্তনযুগল দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অনাঘ্রাত পূজার কুসুম দুটি। ...সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথও তখন একটা সিমকার্ড কিনতে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা বিভিন্ন তরুণীদের তিনি টেলিফোন করে জানতে চাইবেন— "সখী, ভালবাসা কারে কয় ?"

পল্টু স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখানে রবীন্দ্রনাথ কোত্থেকে এলেন ?' আমি বললাম, 'পরাবাস্তব গল্পে সব কিছুই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ হাফপ্যান্ট পরে বিড়ি ফুকতে ফুকতে চলে আসতে পারেন। নিউমার্কেট কাঁচা বাজার থেকে রাতা মুরগি এবং হিদল শুঁটকি কিনে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে বলতে পারেন, ওগো মৃ মুরগির সালুন কর। হিদলের ভর্তা কর। আর আমাকে কাদের সিদ্দিকী সাহেবের গামছাটা দাও। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।'

'কাদের সিদ্দিকীর গামছা মানে ?'

'পলিটিক্যাল গামছা, স্যার। টেকসই, সহজে রঙ যায় না।'

পল্টু স্যার বললেন, 'এসব কি বলছ ? তোমাকে বই পড়ে শুনাতে হবে না। তুমি বাসায় চলে যাও ঘুমাও।'

'আমি রাতে হাসপাতালেই থাকব।'

'ঘুমাবে কোথায় ?'

'ঘুমাব না। জেগে থাকব। কাল সারা রাত জেগেছিলাম, তার আগের রাতেও জেগেছিলাম।'

'কেন ?'

'বাবার উপদেশ। বাবা বলে গেছেন— মাসে তিন দিন তিন রাত ঘুমাবি না। এক পলকের জন্যেও চোখের পাতা এক করবি না।'

পল্টু স্যার বললেন, 'কেন ?'

আমি বললাম, 'স্লীপ ডিপ্রাইভেশন হলে কিংবা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব হলে— অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আমার বাবা চাচ্ছিলেন যেন আমি এই সব ঘটনা দেখি।'

পল্টু স্যার বললেন, 'তাহলে আমিও তোমার মতো জেগে থাকব।'

'সেটা খারাপ না। জাগরণে যায় বিভাবরী।'

পল্টু স্যার জেগে থাকার চেষ্টা প্রাণপণ করলেন বলেই মুহূর্তেই ঘুমিয়ে গেলেন। আমি জেগে রইলাম। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে; আমি বলি— এই চোখবাবারা জেগে থাকো। তোমরা দু'জনই ভাল। দু'জনই লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা।

স্লীপ ডিপ্রাইভেশন এক ধরনের ঘোর তৈরি করে। বাস্তব জগৎ বিড়ালের সীমকার্ড খাওয়ার জগৎ হয়ে যায়। রিয়েলিটির সংশয় তৈরি হয়। যেমন শেষ রাতে আমার কাছে মনে হল কেবিনে একটা অন্ধ বিড়াল ঢুকেছে। সে ছোটাছুটি করতে গিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে এবং মিউমিউ করছে। কয়েকবার ঘনঘন চোখের পলক ফেলার পর বিড়াল অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে সমস্যার সমাধান হল না। তখন দেখলাম খাটে মাজেদা খালা শুয়ে আছেন। পল্টু স্যার না।

আমি বললাম, 'খালা, তুমি এখানে কেন ?'

খালা বললেন, 'তাতে তোর কোনো সমস্যা ? আমি কি করব না করব তা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।'

'তুমিই তাহলে তোমার প্রভু ?'

'হেঁয়ালি কথা বন্ধ করবি ?'

'অন্ধ বিড়ালটা দেখেছ, খালা ?'

'নাতো!'

'তোমার মোবাইলটা সাবধানে রাখ। বিড়াল অন্ধ হলেও দুষ্টু আছে। মোবাইল খুলে তোমার সিমকার্ড খেয়ে ফেলবে।'

'কি সর্বনাশ! আগে বলবি না! দুনিয়ার নাম্বার আমার এই সিমকার্ডে। এটা খেয়ে ফেললে আমার গতি কি হবে ?'

স্লীপ ডিপ্রাইভেশনে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। বাটি ভর্তি গরম দুধ নিয়ে বসেছেন। পাউরুটি দুধে চুবিয়ে চুবিয়ে খাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'কি খাচ্ছ বাবা ?'

বাবা বললেন, 'পাউরুটি খাচ্ছি। শরীরটা গেছে। সহজপাচ্য খাবার ছাড়া কিছু খেতে পারি না। অম্বল হয়।'

'চোখ এ রকম পিটপিট করছ কেন ? চোখে কি কোনো সমস্যা ?'

'চোখে দেখি না।'

'কবে থেকে দেখ না ?'

'দিন তারিখ ডায়েরিতে নোট করে রাখি নাই।'

'খুব সমস্যা হচ্ছে ?'

'না, খুব আরাম হচ্ছে। গাধা ছেলে!'

'পরকালে মানুষ অন্ধ হয় এটা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল পরকালে সবার চির যৌবন এবং...'

'চুপ কর। কট কট করে কথা বলবি না। শান্তিমতো নাস্তা খেতে দে। খাটের উপর শুয়ে আছে এই বুড়া কে ?'

'তুমিতো চোখে দেখ না। বুঝলে কি করে খাটে এক বুড়ো শুয়ে আছে ?'

'অনুমানে বুঝেছি। এই বুড়োর সমস্যা কি ?'

'উনার সমস্যা কিডনী। দু'টা কিডনী। দু'টাই অচল। আচ্ছা বাবা ভাল কথা এইসব ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের ভূমিকা কি হবে ? মহাপুরুষ কি তৎক্ষণাৎ নিজেরটা দিয়ে দেবেন ?'

'না।'

'না কেন ?'

'মহাপুরুষদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। ভাল খাওয়া-দাওয়া, শান্তির নিদ্রা তাদের প্রয়োজন।'

'বাবা, তুমিতো একেক সময় একেক কথা বল।'

বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিকই ধরেছিস। অন্ধ হবার পর থেকে কথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। যাই হোক, তুই শান্তিতে ঘুমো। তিনবার বল 'ঘুম শান্তি, ঘুম শান্তি, ঘুম শান্তি' আরামের ঘুম হবে।'

আমি তিনবার 'ঘুম শান্তি' বললাম। সারাজীবন শুনেছি 'ওম শান্তি' এখন শুনছি 'ঘুম শান্তি'। সমস্যা নেই, আমার ঘুম দিয়ে কথা। লাশকাটা ঘরের শান্তিময় জীবনানন্দ স্টাইলের নিদ্রা।

আমার ঘুম ভাঙল এক বুড়োর কথাবার্তায়। পল্টু স্যারের সঙ্গে এই বুড়ো হম্বিতম্বির ভঙ্গিতে কথা বলছে। গলা মিষ্টি। বিশেষ ভঙ্গিতে কর্কশ করার চেষ্টা চলছে। কর্কশ হচ্ছে না। যে কথা বলছে সে সংগীতশিল্পী হলে নাম করত।

‘মেঝেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে এ কে ? তোমার সার্ভেন্ট ?’

‘কেয়ার টেকার। নাম হিমু।’

‘যে সার্ভেন্ট তাকে সার্ভেন্ট বলবে। কেয়ার টেকার আবার কি ?’

‘সার্ভেন্ট শুনতে খারাপ লাগে।’

‘খারাপ লাগার কিছু নাই। যে যা তাকে তাই বলতে হবে। নয়ত এরা মাথায় উঠবে। এর নাম কি ?’

‘হিমালয়।’

‘বা বা নামের তো বিরাট বাহার। নয়টা বাজে, এখনো শুয়ে ঘুমাচ্ছে— এই শোন, এই।’

আমি চোখ মেললাম। ঘুম আগেই ভেঙেছিল। এখন চোখ পিটপিট করছি। বুড়োকে দেখছি। সৌম্য চেহারা। দাড়ি আছে। পরেছেন নীল রঙের আচকান। হাতে বাহারী ছড়ি থাকার কারণে— নাটকের সম্রাট শাহজাহানের মত লাগছে।

ভদ্রলোক বললেন, ‘তোকে রাখা হয়েছে রুগীর সেবা করার জন্য। আর তুই হা করে ঘুমাচ্ছিস।’

আমি বললাম, সরি।

‘খবরদার, আর কোনোদিন সরি বলবি না। চাকর-বাকরের মুখে ‘সরি’ থ্যাংকয়্যু এইসব মানায় না। আর শোন, তোকে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা এসব ডাকতে পারব না। এখন থেকে তোর নাম আবদুল। বুঝেছিস ?’

‘বুঝেছি স্যার।’

‘আমি পল্টুর আপন চাচা।’

‘চাচা স্লামালিকুম।’

‘আমাকে চাচা ডাকবি না। তোর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা নাই। আমাকে ডাকবি স্যার।’

‘ইয়েস স্যার।’

‘চিৎকার করে ইয়েস স্যার বলবি না, তুই মিলিটারিতে ঢুকস নাই। বদপুলা।’

চাকরদের স্টাইলে অর্থহীন হাসি দিলাম। বাড়ির দামি কোনো কাচের জিনিস ভাঙলে চাকর এবং বুয়ারা যে রকম হাসি দেয়। সেই হাসিতে লজ্জা থাকে, অপ্রস্তুত ভাব থাকে। কঠিন হাসি।

বৃদ্ধ বললেন, ‘আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। রোগীকে তার বাসায় নামিয়ে দিব। তুই হাসপাতালের অফিসে যা। রিলিজের বিষয়ে কি করতে হবে খোঁজ নে।’

==

আমি ঘর থেকে বের হতে হতে শুনলাম পল্টু স্যার বললেন, 'চাচা, তুই তুই করে বলছেন কেন ?'

বুড়ো খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'তুই করব নাতো কি আপনি আপনি করে কোলে বসাব ? পল্টু শোন, ছোট জাতকে ছোট জাতের মতো রাখতে হয়। আদর দিলে লাফ দিয়ে মাথায় উঠে। মাথায় উঠেই ক্ষ্যান্ত হয় না। মাথায় "হেগে" দেয়।'

'মাথায় হেগে দিবে কেন ?'

'তাদের স্বভাব 'হাগা' এই জন্যে হাগবে।'

জটিল এই বৃদ্ধ সম্পর্কে পরের কয়েক দিন যা জানলাম তা হচ্ছে—

এই বৃদ্ধের নাম আবদুস সাত্তার। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। টিকাটুলিতে তার চেম্বার। চেম্বারের নাম শেফা ক্লিনিক। নিচে লেখা ধনন্তরি হোমিও চিকিৎসক, এ সাত্তার MC. MR. PL (ডাবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)।

ধনন্তরি বানান ভুল। MC. MR. PL এ কি হয় তা জানা যায় নি। আমি উনার ক্লিনিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি চশমার ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুই চাকর, তুই থাকবি চাকরের মতো তুই MC র বুঝবি কি ? আর তুই এখানে এসেছিস কেন ? আমার চেম্বারে তোর দরকার কি ?'

'স্যারের জন্যে ওষুধ নিতে এসেছি। উনার ঘুম কম হচ্ছে। হোমিওপ্যাথিতে ঘুমের ওষুধ আছে ?'

'গাধার মতো কথা বলবি না। এমন ওষুধ আছে, এক ফোঁটা খাওয়ায় দিলে হাতি সাত দিন ঘুমাবে।'

'আমি মুখ শুকনা করে বললাম, হাতিরা কি আপনার কাছ থেকে অষুধ নেয় ?'

আব্দুস সাত্তার বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর এসিসটেন্টকে বললেন, 'এই গাধাটাকে কানে ধরে চেম্বার থেকে বের করে দাও। আর কোনো দিন যদি দেখি এই বদটা আমার চেম্বারে ঘুরঘুর করছে, তাহলে সবার চাকরি যাবে।'

আব্দুস সাত্তার সাহেবের সম্পর্কে আর যা জানলাম তা হল— তাঁর একটাই ছেলে। ছেলের নাম সোহাগ। বয়স আঠারো-উনিশ, এলাকার ক্যারম চ্যাম্পিয়ন। প্রতি বোর্ড বিশ টাকা বাজিতে সারাদিন ক্যারাম খেলে। সন্ধ্যার পর বাজি জেতা টাকায় ফেনসিডিল খেয়ে ঝিম ধরে থাকে। তার

ফেনসি বন্ধুদের নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ছোটখাট ছিনতাই করে। ভদ্র ছিনতাই। যেমন— কোনো বৃদ্ধ সন্ধ্যার পর রিকশা করে বাড়ি ফিরছে। তখন সোহাগ চেঁচিয়ে বলবে, 'এই যে মুরুব্বী! আপনার কি যেন পড়ে গেছে।' তখন রিকশা থামে। বৃদ্ধ কি পড়ে গেছে দেখার জন্যে পেছনে তাকান। সোহাগ তখন একটা মানিব্যাগ হাতে এগিয়ে আসে। এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'মুরুব্বী! এই মানিব্যাগটা পড়েছে। এটা কি আপনার ? ব্যাগ ভর্তি টাকা।'

বেশির ভাগ বৃদ্ধরাই বলে, 'হ্যাঁ বাবা, আমার। আল্লাহ তোমার ভাল করুক।'

'মানিব্যাগে কত টাকা আছে বলতে পারেন ?'

'বাবা, গনা নাই।'

'বুড়ামিয়া! দুই দিন পরে কবরে যাবেন— লোভ আছে ষোল আনা। অন্যের ব্যাগ বলতেছেন নিজের!'

'বাবা, ভুল হয়েছে। অন্ধকারে বুঝি নাই। আমার মানিব্যাগ পকেটেই আছে।'

'দেখি। পকেটের মানিব্যাগ দেখি।'

এর মধ্যে দলের বাকিরা এসে রিকশা ঘিরে দাঁড়ায়। একজনের হাতে সুন্দর কাজ করা রাজস্থানী ছুরি। এই ছুরির বিশেষত্ব হচ্ছে এম্নিতে দেখলে মনে হবে লতা ফুল আঁকা ছয় ইঞ্চি ধাতুর স্কেল। বোতাম টিপলেই খটাস শব্দে ছুরি বের হয়ে আসে। ছুরির মাথা বকের ঠোঁটের মতো সামান্য বাঁকা।

বৃদ্ধ খটাস শব্দে ছুরি বের হওয়া দেখে। ততক্ষণে তার আক্কেল গুরুম হয়ে গেছে।

'মুরুব্বী মানিব্যাগটা দিয়ে কানে ধরে বসে থাকেন। মিথ্যা বলার শাস্তি। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য রাখব। কান থেকে হাত সরালেই এই ছুরি পেটে হান্দায়া দেব।'

বিশেষ একটা জায়গা (জিয়ার মাজারের দক্ষিণ পাশে অনেককেই কানে ধরে যেতে দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালিটির লোকজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে— এই জায়গায় স্ট্রিট লাইট সব সময় নষ্ট থাকে।)

এত কিছু জানলাম কিভাবে ? একটু পরে বলি ? আগে তরুণী মেয়েদের কাছ থেকে গয়না এবং ব্যাগ কিভাবে নেয়া হয় এটা বলি। মনে করা যাক কোনো এক তরুণী রিকশা করে যাচ্ছে। জায়গাটা অন্ধকার দেখে তরুণী খানিকটা ভীত। হঠাৎ সে দেখবে এক যুবক (সোহাগ) এগিয়ে আসছে এবং ব্যাকুল গলায় বলছে, 'আপু, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। প্লীজ আপু! প্লীজ!' মেয়ে

===
কিছু বলার আগেই রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে দেয়। সোহাগ এগিয়ে আসে। হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'বন্ধুর সঙ্গে একটা বাজি ধরেছি। বাজি জিতলে এক হাজার টাকা পাই। আপা, আপনার পায়ে ধরি— help me.'

তরুণী তখন বলে, 'কি বাজি ?'

'আপনাকে চুমু খাব, আপনি কিছুই বলবেন না। এই বাজি। আপু, আমি দাঁত ক্লোজআপ টুথপেস্ট দিয়ে মেজে এসেছি— কোনো সমস্যা নেই।'

রিকশাওয়ালা ভাই, তুমি অন্য দিকে তাকাও। তুমি থাকায় আপু লজ্জা পাচ্ছে। আপু ঐ যে দেখুন আমার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে বাজির ফলাফল দেখার জন্য। ওদেরকে বলে দিয়েছি যেন মোবাইল দিয়ে ছবি না তুলে। কেউ যদি ছবি তুলে তাহলে ভুড়ির মধ্যে ছুরি ঢুকায়ে দিব। এই দেখেন ছুরি।' খটশ শব্দ হয়। ফলার ভেতর থেকে রাজস্থানী ছুরি বের হয়ে আসে।

চুমুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে তরুণী সঙ্গে যা আছে সবই দিয়ে দেয়। হাত ব্যাগ, ঘড়ি, গলায় চেইন, ইমিটেশন গয়না। কিছুই নিজের কাছে রাখে না। ছিনতাই দলের প্রধান তখন অতি ভদ্র ভঙ্গিতে বলে— 'সব কেন দিয়ে দেবেন আপা! রিকশা ভাড়া দিতে হবে না ? বিশটা টাকা রাখুন, আপু। এই রিকশাওয়ালা! আপুকে সাবধানে নিয়ে যাও। অন্ধকার জায়গা এভয়েড করবে। দিনকাল খারাপ।'

ঘটনা যা বললাম সবই পত্রিকায় প্রকাশিত। ছিনতাইকারি দলের প্রধান ক্যারাম চ্যাম্পিয়ান সোহাগ যে পল্টু স্যারের আপন চাচাতো ভাই সেটা কি ভাবে জানলাম বলি—

হাসপাতাল থেকে ফেরার দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যায় পল্টু স্যার অস্থির হয়ে পড়লেন, নতুন বই কিনবেন। ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, 'গাড়ি বের কর।'

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, গাড়িতো বসে গেছে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'গাড়ি বসে গেছে মানে কি ? গাড়িতো বসেই থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে না।'

'ব্যাটারি বসে গেছে, স্যার। নতুন ব্যাটারি কিনতে হবে।'

'দুই মাস আগে না ব্যাটারি কিনলে ?'

'ব্যাটারী হল লাকের ব্যাপার। কোনো ব্যাটারি দুই দিনেই শেষ হয় আবার কোনোটা দুই বছর চলে। ঠিক না হিমু ভাই ?'

বলেই ড্রাইভার আমাকে চোখ টিপ দিল। বাধ্য হয়ে আমাকেও চোখ টিপ দিয়ে টিপ ফেরত দিতে হল।

সে আমার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ যেতে চাচ্ছে। কাজের লোক, বুয়া, মালী, ড্রাইভার, দারোয়ান এদের রসুনের বোঁটা হয়ে থাকাই নিয়ম। একজনের অপরাধ সবার অপরাধ।

ড্রাইভার বলল, 'পাঁচ হাজার টাকা দেন স্যার, নতুন ব্যাটারি নিয়ে আসি। তবে আজ গাড়ি বের করতে পারবেন না।'

পল্টু স্যার ড্রাইভারকে ব্যাটারির টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে বই কিনতে বের হলেন। আমরা রিকশা করে যাচ্ছি— যথাসময়ে এবং যথাজায়গায় একজন টাকা ভর্তি মানিব্যাগ নিয়ে ছুটে এল এবং চেঁচাতে লাগলো 'মুরুব্বী, এই মানিব্যাগ কি আপনার?' পল্টু স্যার বললেন, 'কে সোহাগ না? কেমন আছ?'

যুবক চোখ মুখ কুঁচকে ফেলে বলল, 'ভাল আছি পল্টু ভাইজান।'

পল্টু স্যার বলল, 'এই মানিব্যাগ আমার না। আমারটা পকেটেই আছে। মনে হয় অন্য কারোর।'

আমি বললাম, 'ভাই, মানিব্যাগটা আমার। পকেট থেকে পড়ে গেছে খেয়াল করি নাই।'

সোহাগের বন্ধুরা এগিয়ে আসছিল। সোহাগের ইশারায় তারা পিছনে সরে গেল।

সোহাগ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার যে মানিব্যাগ তার প্রমাণ কি? এখানে কত টাকা আছে বলতে পারবেন?'

আমি বললাম, 'এখানে আছে উনিশশ' দশ টাকা। ভাই, আপনি গুনে দেখেন।'

পল্টু স্যার বললেন, 'দেখি, আমি গুনে দেই। টাকা গুনতে আমার ভাল লাগে। বইয়ের পাতা উল্টাতে যেমন ভাল লাগে, টাকা গুনতেও ভাল লাগে। টাকা গুনার সময় মনে হয় বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি।'

টাকা গুনে দেখা গেল উনিশ'শ দশ টাকাই আছে। কাকতালীয় ব্যাপার ছাড়া কিছুই না। সবার জীবনেই কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। আমার বেলায় একটু বেশি বেশি ঘটে।

সোহাগকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে আমরা চলে এলাম। পল্টু স্যার বললেন, 'আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এই ছেলের পাওয়ার কথা। আমার কোনো ওয়ারিশ নাই।'

আমি বললাম, 'স্যার, আপনার কি অনেক টাকা-পয়সা?'

পল্টু স্যার বললেন, 'হুঁ।'

==

আমি বললাম, 'এত টাকা কিভাবে করেছেন ?'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমি করব কিভাবে ? আমার বাবা করেছেন। ব্যবসা করতেন। কিসের ব্যবসা কিছুই জানি না। তাঁর কথা ছিল যেদিন বিশ কোটি টাকার সম্পদ হবে সেদিন তিনি তওবা করে টাকা রোজগার বন্ধ করবেন।'

'তওবা করার সুযোগ কি পেয়েছিলেন স্যার ?'

'না। যেদিন তওবা করার কথা ছিল সেদিন সকাল বেলায় নাস্তা খাবার সময় মাংসের টুকরা গলায় আটকে গেল। আমি তখন তাঁর সামনে বসে নাস্তা খাচ্ছিলাম। আমি বুঝতেই পারি নাই বাবা মারা যাচ্ছেন। আমি ভাবছি বাবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? তারপরেই— 'ধুম!'

'ধুম কি ?'

'ধুম করে উনার মাথাটা টেবিলে পড়ে গেল। তুমি আবার ভেবো না মাথা খুলে টেবিলে পড়ে গেছে। উনাকে সহ-ই পড়েছে। মাথা টেবিলে লেগে ধুম শব্দ হয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

পল্টু স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— 'ধুম বলা ঠিক হয় নাই। বলা উচিত ধুম ঝনঝন। ধুম করে মাথাটা টেবিলে লাগল। টেবিলে পানির যে গ্লাস ছিল সেটা মেঝেতে পরে ভেঙে শব্দ হল ঝনঝন। কাজেই ধুম ঝনঝন।'

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। বাবার মৃত্যু যে কারো কাছে ধুম ঝনঝন হতে পারে তা আমার ধারণাতে নেই। একজন সর্ববিষয়ে নির্বিকার মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে। উনি কি মহাপুরুষদের মতো চরম নিরাসক্তদের একজন। মহাপুরুষ সম্পর্কে আমার বাবার ধ্যান-ধারণা এ রকমই। মহাপুরুষদের নানান লক্ষণ বলতে গিয়ে তিনি বলছেন—

আসক্তি

চরম আসক্তির অন্য নাম নিরাসক্তি। মহাপুরুষরা সর্ববিষয়ে যে নিরাসক্তি দেখাইয়া থাকেন তাহা চরম আসক্তিরই অন্য পরিচয়। তোমাকে উদাহরণ দিয়া বুঝাই— মনে কর এক লোকের মদ্যপানের কিছু নেশা আছে। সেই ব্যক্তি মাঝে মধ্যে কিছু মদ্যপান করিবে।

===

> তাহার জন্যে নানান আয়োজন করিবে। মদ্যপানের সময় চাটের ব্যবস্থা, সংগীত শ্রবণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই লোকই যখন মদ্যপানে চরম আসক্তি দেখাইবে তখন সে শুড়িখানায় উপস্থিত হইবে— তখন তাহার চাটের প্রয়োজন নাই, সংগীতেরও প্রয়োজন নাই। মদ্য হইলেই হইল। এই আসক্তি আরো বাড়িলে মদ্য পানেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। নেশার বস্তু থাকিবে কিন্তু নেশা থাকিবে না।

একগাদা বই কিনে বাসায় ফিরে দেখি ড্রাইভারের ঘরের সামনের বেঞ্চিতে সোহাগ বসে আছে। হাতে সিগারেট।

পল্টু স্যারকে দেখে সে সিগারেট লুকানোর চেষ্টা করল। স্যার তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। হাত ভর্তি বই নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। এক্ষুণি তাকে বই পড়া শুরু করতে হবে। খেজুরে আলাপের সময় নেই।

ড্রাইভার চাপা গলায় ডাকল, 'হিমু ভাই, শুনে যান। আপনার সঙ্গে কথা আছে। সোহাগ ভাইজান কি জানি বলবে। আপনি উনারে চিনেনতো ?'

আমি বললাম, 'দেখা হয়েছে। ওস্তাদ মানুষ।'

সোহাগ সিগারেট ছুড়ে ফেলে বলল, 'যে দেখা হয়েছে, সেই দেখা কোনো দেখাই না। তোমার সঙ্গে আসল দেখা বাকি আছে।'

আমি বললাম, 'আসল দেখা কখন হবে ? রোজ হাশরের ময়দানে ?'

'রোজ হাশর আমি তোমারে দেখায়ে দিব। মানিব্যাগ আন।'

'মানিব্যাগতো জমা দিয়ে দিয়েছি।'

'কোথায় জমা দিয়েছ।'

'ধানমন্ডি থানার ওসি সাহেবের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছি। উনি যেন আসল মালিককে ফিরত দেন।'

'আমাকে ধানমন্ডি থানা চিনাও ? চল আমার সঙ্গে থানায়। ব্যাগ রিলিজ করে নিয়ে আস।'

ড্রাইভার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'মানিব্যাগ দিয়ে দেন হিমু ভাই। এই লোক কিন্তু ডেনজার।'

আমি সোহাগের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাইজান, আপনি না-কি ডেনজার ?'

সোহাগ বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'প্রমাণ চাস ? তুই প্রমাণ চাস (সে যে ডেনজার এটা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় তুই তুই

করে বলছে। তবে একটা হাত পকেটে ঢুকেছে। মনে হচ্ছে রাজস্থানী বস্তু বের হবে।)

'কি, কথা বলস না কেন, প্রমাণ চাস ?'

আমি বললাম, 'প্রমাণ সবাই চায়। পাকিস্তানী মিলিটারী প্রমাণ চেয়েছে। হিন্দু না মুসলমান এই প্রমাণ। অনেককেই লুঙ্গি খুলে যন্ত্রপাতি দেখাতে হয়েছে।'

ড্রাইভার ভীত গলায় বলল, 'ভাইজান, এইখানে কিছু করবেন না। যা করার বাইরে নিয়া করেন।'

সোহাগ রাজস্থানী ছুড়ির বোতাম টিপে যাচ্ছে— জিনিস বের হচ্ছে না। আমি বললাম, 'নষ্ট হয়ে গেছে না-কি ?'

সোহাগ আগুন চোখে তাকাল। আমি বললাম, 'নষ্ট জিনিস পকেটে রাখা ঠিক না। তারপর আবার করেছেন টিপাটিপি। এই জিনিস পকেটে রাখবেন, হঠাৎ আপনা আপনি খুলে যাবে— পুট করে আপনার বিচি একটা খুলে পড়ে যাবে। তখন সবাই আপনাকে ডাকবে এক বিচির সোহাগ।'

ড্রাইভার মহাচিন্তিত গলায় বলল, 'হিমু ভাই, এইসব কি বলেন ? আপনি কারে কি বলতেছেন নিজেও জানেন না।'

সোহাগ বলল, 'জানবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জানবে। যদি না জানে আমি পিতা-মাতার সন্তান না। আমি জারজ সন্তান।'

ড্রাইভার সোহাগের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে ঝামেলা চায় না। গাড়ির তেল, ব্যাটারি, টায়ার এসব মাঝে মাঝে চুরি করে সে জীবনটা পার করে দিতে চায়।

ঘরে ঢুকে দেখি পল্টু স্যার বই নিয়ে বসে গেছেন। তাঁর মুখ প্রশান্ত। যে লেখক এই বইটি লিখেছেন তিনি দৃশ্যটা দেখলে আরাম পেতেন। অবশ্যই তাঁর কাছে মনে হতো তাঁর লেখক জীবন স্বার্থক।

'স্যার, চা বা কফি কিছু লাগবে ?'

'না।'

'লেবুর সরবত করে দেব ? ক্লান্তি দূর হবে।'

'তাহলে করে দাও।'

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি লেবু নেই। আমি স্যারকে বললাম, 'স্যার, ঘরে লেবু নেই। লেবু ছাড়া লেবুর সরবত করে দেব ?'

'দাও। লেবুর সরবত দিয়ে চেষ্টা করতে থাক লকারটা খুলতে পার কি-না। রিং ঘুরাতে থাক। এক সময় না এক সময় খুলবেই। সাতটা মাত্র সংখ্যা। আমার ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু লকারে আছে। কী আছে মনে করতে পারছি না।'

==

আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি। শুরু করেছি ০ দিয়ে—

০০০০০০০

০০০০০০১

০০০০০১১

০০০০১১১

এতো দেখি ভয়াবহ ব্যাপার। মোট কতবার ঘুরালে একবার না একবার বিশেষ সংখ্যাটা চলে আসবে তাই বা কে জানে।

বাদলকে জিজ্ঞেস করলে পাওয়া যাবে। অঙ্ক তার কাছে ছেলেখেলা।

আমি রিং ঘুরিয়েই যাচ্ছি।

==



রানু টাকা নিয়ে এসেছে। সবটা আনতে পারেনি, এক হাজার তিনশ টাকা এনেছে। টাকার সঙ্গে প্লাস্টিকের দু'টা আইসক্রীমের বাটি। একটা বাটিতে মোরগ-পোলাও, অন্য বাটিতে ফিরনী। দু'টাই সে নিজে রান্না করেছে। আমার ধারণা ঐ দিনের খাবারটা ফেরত দিতে চাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মেয়ে ঋণ রেখে মরে যাওয়া টাইপ না।

রানু বলল, 'আপনি এই বাড়ির কে বলুনতো। আমি দারোয়ানকে বললাম, "হিমু সাহেবের ফ্ল্যাটে যাব।" দারোয়ান চেনে না।'

'আমি এই বাড়ির চাকর। ভদ্র ভাষায় গৃহভৃত্য। "বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন টাইপ।" আমাকে চেনার কথা না। চাকরের পরিচয়ে ফ্ল্যাটের পরিচয় না।'

রানু বলল, 'আপনি কেন সব সময় আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলেন? ঐ যে বুড়ো মানুষটা ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন, তিনি আপনার কে হন?'

'মুনিব হন। উনি মুনিব, আমি ভৃত্য।'

'অসম্ভব। উনি আপনার বাবা। আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে পল্টু স্যার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। এবং চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'হিমু, বাবুই পাখি তালগাছ ছাড়া অন্য কোথাও বাসা বাঁধে না?'

'জ্বি না, স্যার।'

'যদি সব তালগাছ কেটে ফেলা হয়, তখন ওরা কোথায় বাসা বাঁধবে?'

'ওরা একটা সমস্যায় তো পড়বেই। অন্য কোনো গাছে ট্রাই করবে।'

'কোন গাছ?'

'আমার ধারণা, সুপারি গাছে প্রথম চেষ্টা করবে।'

পল্টু স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'জিনিসটা অদ্ভুত না? বাবুই পাখিদের তালগাছেই বাসা বাঁধতে হবে? গভীর কোনো চিন্তার বিষয় এর মধ্যে আছে।'

'চিন্তার বিষয়তো আছেই।'

===

'ঐ মেয়ে কে ?'

'স্যার, আমাদের বাবুর্চি।'

পল্টু স্যার খুবই অবাক হয়ে বললেন, 'আমাদের বাবুর্চি আছে, জানতাম নাতো! নিজেদের বাবুর্চি আছে, অথচ আমরা হোটেল থেকে খাবার এনে খাচ্ছি কেন ?'

আমি বললাম, 'আজই এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সে তার রান্নার স্যাম্পলও নিয়ে এসেছে। দুপুরে আপনাকে খেতে দেব। মোরগ-পোলাও আর ফিরনী। খেয়ে যদি আপনার পছন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পারমানেন্ট।'

পল্টু স্যার বললেন, 'এক বেলার রান্না খেয়ে তার রন্ধনশৈলী বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

আমি বললাম, 'তাহলে এক সপ্তাহ রাঁধুক এক সপ্তাহ পরে বিবেচনা করা হবে।'

'মেয়েটার নাম কি ?'

'স্যার, আপনিই জিজ্ঞেস করুন।'

আমি রানুর দিকে তাকালাম। সে আমাদের কথাবার্তায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অতি বুদ্ধিমতীরাও বিভ্রান্ত হবে। পল্টু স্যার হাতের বই বন্ধ করে চোখের চশমা ঠিক করলেন। চশমা ঠিক করা মানে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা। পল্টু স্যার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এই কাজটা করেন।

'নাম কি বল!'

'রানু।'

'রান্না কোথায় শিখেছ ?'

'মা'র কাছে শিখেছি।'

'মনে কর তুমি কৈ মাছের ঝোল রান্না করছ। সাধারণ লবণ দিয়ে রান্না করলে যে স্বাদ হবে, বিট লবণ দিয়ে রান্না করলেও কি একই স্বাদ হবে ?'

'বিট লবণ দিয়ে যে মাছের ঝোল রান্না করা যায় এটাই আমি জানি না।'

'কোন রান্নাটা তুমি ভাল পার ?'

'ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল।'

পল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হিমু, চট করে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসো। আমারো হঠাৎ করে কেন জানি ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খেতে ইচ্ছা করছে। বাবুর্চির চাকরি পার্মানেন্ট হবে কি-না তা ইলিশ মাছের ডিম রান্নার উপর নির্ভর করবে।'

রানুর হতভম্ব ভাব ক্রমেই বাড়ছে। এক সময় সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কঠিন গলায় বলল, 'একটা ভুল হচ্ছে। আমি বাবুর্চির কাজের জন্যে এ বাড়িতে আসি নি। আমাকে এসব কেন বলছেন? আমাকে দেখে কি বাবুর্চির মতো লাগছে?'

পল্টু স্যার আমার দিকে সাহায্যের জন্যে তাকালেন। রানুর কথায় তিনিও খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'রানু শোন, আয়া বা বাবুর্চি এরা দেখতে আলাদা হয় না। এদের কোনো আলাদা পোশাকও নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কি তোমার ভাবভঙ্গির মধ্যে কিছু বাবুর্চি ভাব অবশ্যই আছে।'

পল্টু স্যার ভরসা পেয়ে বললেন, 'অবশ্যই অবশ্যই। খুবই সত্যি কথা। কথাবার্তা বুয়া টাইপ। ঝগড়া ঝগড়া ভাব।'

আমি বললাম, 'তারপরেও তোমাকে বাবুর্চির চাকরি অফার করায় তোমার যদি সম্মান হানি হয়ে থাকে, তাহলে আমি এবং স্যার আমরা দু'জনই দুঃখিত।'

পল্টু স্যার বললেন, 'হ্যাঁ দুঃখিত। তবে বাবুর্চির কাজের মধ্যে কোনো অসম্মান নেই। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাবুর্চি ছিলেন যেমন এরিস্টটল, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি।'

রানু বলল, 'উনারা বাবুর্চি ছিলেন?'

পল্টু স্যার বললেন, 'অবশ্যই। নিজেরা নিজেদের খাবার রান্না করে খেতেন। এখন তুমি বল, বেতন কত চাও?'

রানু বলল, 'বেতন কত চাই মানে কি?'

'তুমি নিশ্চয়ই বেতন ছাড়া কাজ করবে না। আর আমার পক্ষেও আকাশ-পাতাল বেতন দিয়ে বাবুর্চি রাখা সম্ভব না। লবার খোলা যাচ্ছে না।'

রানু বলল, 'আমরা একই কথাবার্তায় ঘুরাফিরি করছি। হয় আপনি কনফিউজড নয়ত আমি কনফিউজড। আমি এখন চলে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না। স্লামালিকুম।'

পল্টু স্যার সালামের জবাব না দিয়ে বইয়ে মন দিলেন। পাতা উল্টে বইয়ের দিকে ঝুঁকে এলেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। রানু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি আপনার সঙ্গে আলাদা এক মিনিট কথা বলতে পারি? আড়ালে?'

আমি বললাম, 'আড়ালে যাবার দরকার নেই। এখানেই কথা বলতে পার। স্যার বই পড়া শুরু করেছেন, এখন কোনো কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকবে না। তাঁকে "এই ছাগলা, বই পাগলা" বলে গালিও দিতে পার। তিনি কিছুই বুঝবেন না।'

রানু কঠিন গলায় বলল, 'আপনি দয়া করে অন্য ঘরে আসুন! প্লিজ!'

আমি রানুকে নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। এই বাড়িতে শুধুমাত্র রান্নাঘরেই দু'টা প্লাস্টিকের টুল আছে। পিঁড়ির আধুনিক সংস্করণ। রানুকে বসতে বললাম, সে বসল না। থমথমে গলায় বলল, 'আপনি কি সত্যিই উনার সারভেন্ট ? চাকর বলতে লজ্জা লাগছে বলে সারভেন্ট বলছি।'

আমি বললাম, 'সরাসরি চাকর বলতে পার। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ভৃত্যকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত লাইন আছে— "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।" মালাকার ব্যাটা চাকর ছাড়া কিছু না।'

'হাই লেভেলের কথা বন্ধ করে সরল করে বলুন ঘটনা কি ? আপনি চাকর হবেন কেন ?'

'আমি একটা জরুরি মিশন নিয়ে এখানে কাজ করছি।'

'কি মিশন ?'

'পল্টু স্যার বহু টাকার মালিক। বিশ কোটি টাকার বেশিতো বটেই। উনি মারা গেলেই সোহাগ নামের একজন পুরো সম্পত্তির মালিক হবে। আমার মিশন হচ্ছে উনি যাতে দ্রুত মারা যান, সেই ব্যবস্থা করা।'

'তার মানে ?'

'ভদ্রলোকের সময় ঘনিয়েছে। দু'টা কিডনীই নষ্ট। আমাকে দেখতে হবে তিনি যেন কিডনী ট্রান্সপ্লান্টে রাজি না হন। বুঝতে পারছ ?'

'না।'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'আমি এ বাড়িতে ঢুকেছি তাঁকে কিডনী দেব এই অজুহাতে। এখন তার ধারে-কাছে যাচ্ছি না। স্যারের শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। পরিকল্পনা মতো সব এগুচ্ছে।'

রানু বলল, 'আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে এই গোপন কথাগুলো কেন বলছেন ?'

'তোমাকে বলছি, কারণ তুমিও এই পরিকল্পনার অংশ।'

রানু প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমি কি করে এই পরিকল্পনার অংশ হব ?'

'মাজেদা খালা তোমাকে কিডনী দেবার জন্যে ফিট করেছে। ঠিক বলছি না ?'

রানু হতভম্ব গলায় বলল, 'সেই কিডনী কি উনার জন্যে ?'

'অবশ্যই। তোমাকে কি করতে হবে শোন— বুড়োটাকে নানান কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কিডনী ট্রান্সপ্লান্টটা দেরি করাবে। যেন দ্রুত কর্ম কাবার হয়ে যায়। সোহাগ ভাইজান বগল বাজাতে পারেন।'

রানু বলল, 'আপনি অতি ভয়ংকর মানুষ। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম। আমার উচিত সব কিছু পুলিশে জানানো।'

'ভুলেও এই কাজ করবে না। পুলিশও আমাদের কেনা। সবচে সহজ পণ্য হল মানুষ। মানুষ কেনা কোনো সমস্যাই না। মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে কেনা যায় বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন কখন বিক্রি হবেন।'

'বকবকানিটা বন্ধ করবেন ?'

'করলাম।'

'আমি এখন চলে যাব। তবে ভাববেন না আমি সহজ মেয়ে। একটা মানুষকে খুন করবেন আর আমি সব জেনেশুনেও চুপ করে থাকব ?'

'খুনতো করছি না। নেচারের উপর নির্ভর করছি। নেচার তার কোর্সে চলবে। যথা সময়ে পল্টু স্যার বই পড়তে পড়তে পটল তুলবেন। উনার জন্যেও ভাল। বই পড়তে পড়তে খুব কম মানুষই মারা যায়। শুধু একজনকে পাওয়া গেছে যিনি বই পড়া শেষ করে লাইব্রেরি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা পিছলে মারা গেছেন। মোঘল বাদশা হুমায়ুন।'

রানু বলল, 'আপনার প্রতিটি কথাই অসহ্য লাগছে। আমি কি আরেক বার উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

আমি বললাম, কি কথা বলবে ?

'উনাকে জিজ্ঞেস করে জানব আপনি যা বললেন সেটা সত্যি কি-না।'

'কিভাবে জানবে ? সরাসরি জিজ্ঞেস করবে ? আমাকে ফাসাবে ?'

'আপনার ভয় নেই, সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আমি বোকা মেয়ে না।'

রানুকে আবার পল্টু স্যারের কাছে নিয়ে গেলাম। পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে আনন্দিত গলায় বললেন, 'তোমার বেতন কত ঠিক হয়েছে ?'

রানু বলল, 'স্যার, আমিতো আগেই বলেছি, আমি বাবুর্চির কাজ করব না। আমি শুধু আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।'

পল্টু স্যার বললেন, 'প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। দেখছ না বই পড়ছি ?'

'স্যার ছোট্ট প্রশ্ন, হিমু নামের এই মানুষটা কি আপনাকে কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট করতে নিষেধ করছে ?'

'হ্যাঁ করেছে। এবং তার কথা আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কেন আমি অন্য একজনের শরীরের অংশ নিয়ে বেঁচে থাকব ? যার

==

কিডনী নিলাম, তার থাকবে একটা মাত্র কিডনী। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে বেচারার গতি কি হবে ?'

রানু বলল, 'স্যার, আমি যাই। স্লামালিকুম। একটাই অনুরোধ, আপনার কাজের লোকের কথায় আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'কেন ? আমিতো সোসাইটিতে কোনো কিছু Contribute করতে পারছি না। শুধু বই পড়ছি। আমার বেঁচে থাকা মানে দরিদ্র দেশের কিছু খাবার নষ্ট করা। বাতাস থেকে কিছু অক্সিজেন নিয়ে গ্রিন হাউস এফেক্টকে আগিয়ে নেয়া।'

'এসব যুক্তি কি আপনার ঐ লোক আপনাকে বুঝিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। তার যুক্তি খুবই ভাল। এখন তুমি যাও— বই পড়ছিতো! বই পড়ার সময় ফালতু কথাবার্তা খুবই অসহ্য লাগে।'

রানু বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যে দৃষ্টি সে আমাকে দিল ইংরেজিতে তাকে বলে Ash Look, বাংলায় ভস্ম দৃষ্টি। মুনী-ঋষিদের টাইমে তারা এই দৃষ্টি দিয়ে দুষ্ট লোক ভস্ম বানিয়ে ফেলতেন। সেই ভস্ম গায়ে মেখে সাধনায় বসতেন। ভস্ম নষ্ট হতো না। কাজে লাগতো।

রানু যাবার ঘন্টা খানিকের মধ্যে বাদল এসে উপস্থিত। দরজা খুলতেই সে ঢুকল। কিছুক্ষণ পল্টু স্যারকে জ্বলজ্বল চোখে দেখল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'হিমুদা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কারো একজনের চেহারার মিল পাচ্ছি। কে বলতো!'

আমি বললাম, 'ফিসফিস করে কথা বলতে হবে না। উনি যখন পড়ায় ব্যস্ত থাকেন তখন বাড়ির ছাদে এটম বোমা ফাটলেও উনি ঠিক মতো শুনতে পান না। ভাবেন, বেলুন ফেটেছে। এই সিনড্রমের নাম পাঠ বধির সিনড্রম।

'কার চেহারার সঙ্গে মিল সেটা বল।'

'দু'জনের চেহারার সঙ্গে খুব মিল একজন হচ্ছে আরব্য রজনীর বুড়োটা। যে ঘাড়ে চেপে থাকে, ঘাড় থেকে নামে না।'

'ঠিক বলেছতো।'

'আবার উনি যখন বই পড়া বন্ধ করে মাথা তুলে তাকান তখন তাঁকে খানিকটা টেকো মাথা আইনস্টাইনের মতো লাগে।'

বাদল বলল, 'হিমুদা, দু'দিন যদি তোমার সঙ্গে থাকি তাহলে কোনো সমস্যা আছে ? ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখাও হয় না। থাকব দু'দিন ?'

'থাক।'

'রাতে ঘুমাব কোথায়?'

'মেঝেতে ঘুমাবি। চাকর-বাকরের আত্মীয়-স্বজন এলে কোথায় ঘুমায়? মেঝেতে ঘুমায়। চাকরের আত্মীয় হিসেবে দু'দিন থাক— ভাল লাগতে পারে।'

বাদল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং আইডিয়া। ভদ্রলোক কি পড়ছেন?'

'এখন একটা উপন্যাস পড়ছেন। দেড়শ পৃষ্ঠার উপন্যাস। আমি সেই উপন্যাসের পাতা ব্লেড দিয়ে কেটে সত্তর পৃষ্ঠা করে দিয়েছি। একটা পাতার পরেই তারপরের পাতা মিসিং। দেখতে চাচ্ছি উনি ব্যাপারটা ধরতে পারেন কিনা।'

'ধরতে পারছেন?'

'না। উনি খুব আগ্রহ নিয়ে উপন্যাসটা পড়ছেন। প্রায় শেষ করে ফেলেছেন।'

বাদল মুগ্ধ গলায় বলল, 'দস্তয়েভস্কির উপন্যাস থেকে উঠে আসা কারেক্টর। হিমুদা, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।'

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, 'স্যার এর নাম বাদল, আমার খালাতো ভাই। দু'দিন আমার সঙ্গে থাকবে, খাবে। তবে বিনিময়ে কাজ করে দেবে। ফ্লোর মুছবে। কাপড় ধুয়ে দিবে। লকারটা খোলার ব্যাপারেও কাজ করবে। এর অংকের মাথা ভাল।'

পল্টু স্যার বললেন, 'গুড! ভেরি গুড!'

বাদল বলল, 'স্যার, যে বইটা পড়ছেন সেটা পড়তে কেমন লাগছে?'

পল্টু স্যার বললেন, 'পড়তে খুবই ভাল লাগছে। তবে বইয়ের অনেকগুলো পাতা নেই। কেউ একজন ইভেন নাম্বার দিয়ে শুরু প্রতিটি পাতা কেটে রেখেছে। তাতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না, বরং সুবিধা হচ্ছে।'

বাদল আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কি সুবিধা, স্যার?'

'মিসিং পাতাগুলোতে কি আছে কল্পনা করে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আমি ঠিক করেছি, এরপর যে বই-ই পড়ব তার odd কিংবা even নাম্বারের পাতাগুলো কেটে রাখব।'

বাদল বলল, 'স্যার, আপনিতো মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। দয়া করে একটা বাণী দিন।'

'কি বাণী দেব?'

==

বাদল বলল, 'আপনার মতো মানুষ যা বলবেন সেটাই বাণী। একটা গালি যদি দেন, সেটাও হবে বাণী। দয়া করে আমাকে একটা গালি দিন।

'সত্যি গালি দেব ?'

'জ্বি স্যার।'

'এই মুহূর্তে তেমন কোনো গালি মনে পড়ছে না। একটু পরে দেই ?'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

বাদল আগ্রহ নিয়ে গালির জন্যে অপেক্ষা করছে। পল্টু স্যারকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। সম্ভবত লাগসই গালি পাচ্ছেন না। না পাওয়ারই কথা। বাংলা ভাষায় গালির সম্ভার তত উন্নত না। বেশির ভাগ গালিই পশুর সঙ্গে সম্পর্কিত— কুকুরের বাচ্চা, শুওরের বাচ্চা, গাধার বাচ্চা... নতুন ধরনের গালি কিছু হয়েছে, যেমন— তুই রাজাকার। আরো গালি থাকা দরকার। একটা জাতির সংস্কৃতির অনেক পরিচয়ের একটি হচ্ছে গালির সম্ভার। চীন দেশে গালির অভিধান পর্যন্ত আছে। আহারে কী সভ্যতা!

স্যারের ড্রাইভার এসে দরজা দিয়ে মুখ বের করে চোখ টিপল। চোখ টিপায় এর সীমাহীন পারদর্শিতা। চোখ টিপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল— বিরাট সমস্যা।

আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'কি সমস্যা ?'

ড্রাইভার হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'কিসলু ভাই আসছে। একা আসে নাই, দলেবলে আসছে।'

'কিসলু ভাইটা কে ?'

'সোহাগ ভাইজানের গ্রুপের লিডার। ডেনজার আদমি। আপনারে খবর দিতে বলেছে, খবর দিলাম। এখন আপনে কি করবেন, সেটা আপনার বিবেচনা।'

'আমাকে কি করতে বল ?'

'পালায়া যান। জানে বাঁচেন।'

'জানে মেরে ফেলার সম্ভাবনা কি আছে ?'

'অবশ্যই। বললাম না, ডেনজার আদমি।'

'পালাবো কোন দিক দিয়ে ? এরচে বরং ডেনজার আদমির সঙ্গে কথা বলতে থাকি। সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে ঝেড়ে দৌড়। এক দৌড়ে পগার পার।'

ড্রাইভার শুকনো মুখে বলল, 'আমার যা বলার বলে দিয়েছি। আরেকবার বলতেছি— ডেনজার আদমি।'

==

ডেনজার আদমি কিসলু ভাই, ড্রাইভারের ঘরের সামনের চেয়ারে বসে আছে। সে জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে কমলা রঙের গেঞ্জি পরেছে। গেঞ্জিতে লেখা— Love Bangladesh. বঙ্গ প্রেমিকের চেহারায় ইঁদুর ভাব আছে। সব মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে তা-না। কিছু মনে হয় ইঁদুর থেকেও এসেছে। আমি ডেনজার আদমির কাছে এগিয়ে গেলাম। ড্রাইভার অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। ডেনজার আদমির লোকজন কাউকে দেখছি না। তবে তারা আশেপাশেই যে আছে তা ডেনজার আদমির প্রশান্ত মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি। এই ধরনের বিপজ্জনক লোক একা যখন থাকে তখন অসহায় বোধ করে। আমি ডেনজার স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, এই তুই চাস কিরে শুওরের বাচ্চা ?'

ড্রাইভারের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পরে গেল। সে মাথা ঘুরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো। মনে হচ্ছে তার পৃথিবী উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'এখনো চেয়ারে বসে আছিস! উঠে দাঁড়া তেলাপোকার ছানা!' (তেলাপোকার ছানা গালিটা বের করে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আরো কিছু নতুন গালি আবিষ্কার করে ফেলব।)

'এই তেলাপোকা! তোর নাম কি ?'

হতভম্ব ডেনজার আদমি, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কিসলু।'

'আমার কাছে এসেছিস কি জন্যে ? তোকে কি সোহাগ পাঠিয়েছে ? ঐ মাকড়সাটা এখন কোথায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ?'

'হুঁ।'

'হুঁ কিরে হারামজাদা! বল জ্বি স্যার। তোকে আজ মহব্বত শিখায়ে দিব। সোহাগের রাজস্থানী চাকুটা প্যান্টের ভিতর আপনা-আপনি খুলে গেছে। ঠিক বলেছি না ?'

'জ্বি স্যার।'

'তোর প্যান্টের পকেটেওতো পিস্তল আছে। আছে কি-না বল ?'

'জ্বি স্যার।'

'গুলি নাই, পিস্তল নিয়ে ঘুরছিস কোন মতলবে ? পিস্তলের গুলি কই ?'

ডেনজার আদমি বিড়বিড় করে বলল, 'যে গুলি আছে সেটা এই পিস্তলে ফিটিং হয় না।'

'পিস্তল আর গুলি দেখেশুনে কিনবি না ? আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস ঝটপট বল।'

'ভুল হয়েছে। আপনাকে চিনতে পারি নাই।'

'এখন চিনেছিস ?'

ডেনজার আদমি কিসলু হতাশ চোখে এদিক-ওদিক তাকালো। সে এমনই হতভম্ব হয়েছে যে, মাথা এলোমেলোর পর্যায়ে চলে গেছে। ডেনজার আদমি জাতীয় ছেলেপুলেরা অসম্ভব ভীতু হয়।

'ওস্তাদ, বিদায় দেন, চলে যাই।'

'কানে ধর। কানে ধরে লেফট রাইট করতে করতে যা। তোর বন্ধুরা সবাই যেন দেখে তুই কানে ধরে আছিস। আর শোন, পিস্তলের জন্যে ফিটিং গুলি যেদিন পাবি সেদিন এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। মনে থাকবে ?'

'জ্বি ওস্তাদ।'

'এখনো কানে ধরছিস না কেন ? কানে ধর!'

ডেনজার আদমি কানে ধরল। ড্রাইভারের মুখের হা এতই বড় হয়েছে যে, মুখের ভেতর দিয়ে খাদ্য নালীর খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

'হাঁটা শুরু কর। এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। আবার এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। মনে থাকবে ?'

'মনে থাকবে, ওস্তাদ।'

ডেনজার আদমি চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঢোক গিলছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হামকি ধামকি করে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি— তাই না ফজলু ?'

ফজলু বিড়বিড় করে বলল, 'জ্বি ওস্তাদ।'

মানুষের সবদিন সমান যায় না। কোনো কোনো দিনকে বলা যায় ভেজিটেবল ডে। তাও উল্লেখযোগ্য ভেজিটেবলও না। কদু টাইপ ভেজিটেবল। আবার কিছু দিন থাকে— সংবাদপত্রের ভাষায় ঘটনাবহুল।

যেমন আজকের দিন। ডেনজার আদমি কিসলু ভাইকে বিদায় করে উপরে এসেছি। পল্টু স্যার হাতের উপন্যাস ছুড়ে ফেলে বললেন, 'অসাধারণ উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। টানটান উত্তেজনা। দুপুরের খাবার দাও। দেখি নতুন বাবুর্চি ইলিশ মাছের ডিম কেমন রান্না করেছে। আমার মন বলছে, ভাল হয়েছে।'

বাবুর্চি নেই, ডিমও নেই— এই দুঃসংবাদ দেয়ার আগেই দরজার কলিংবেল বাজল। ঘরে ঢুকল রানু। হাতে টিফিন কেরিয়ারের একটা বাটি।

আমি বললাম, 'কি এনেছ, ডিমের ঝোল ?'

রানু কিছু বলল না। হ্যাঁ, সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে-মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। আমি বললাম, 'স্যারকে খাবার দাও। স্যারের ক্ষিধে লেগেছে।'

রানু বলল, 'আপনার মাজেদা খালা আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে তুমি কাজে লেগে পর। বাদল তোমাকে সাহায্য করবে। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিতে হবে। বাসাবাড়ির কাজ প্রথম করছেতো! এম্নিতে সে ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ায়।'

বাদল মেঝে ঝাট দিচ্ছিল। রানু তার দিকে তাকিয়ে রইল। রানুর ভাবভঙ্গি অধিক শোকে কংক্রিট টাইপ।

মাজেদা খালা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। শুরু করেছেন একটি নিরীহ প্রাণীকে দিয়ে—

এই গাধা,

তুই কি শুরু করেছিস। রানুকে কি বুঝিয়েছিস। মেয়েটা আমার কাছে এসে কেঁদে-টেদে অস্থির। সব সময় রহস্য করা যায় না। মানুষকে স্বাভাবিক আচরণ করতে হয়। বয়সতো কম হয় নি। এখন স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে দেখ।

আমি কয়েকদিন কথা বলে দেখেছি রানু মেয়েটা ভাল। ভাল মেয়েদের কপালে দুঃখ থাকে। এই মেয়ের কপালেও নানান দুঃখ। বেচারি এত কষ্ট করে ঢাকায় আছে। গ্রামে তার মা একা। সেই মায়ের কাছে চিঠি গেছে যে, রানু ঢাকায় বেশ্যাগিরি করে জীবন যাপন করে। সন্ধ্যার পর থেকে তাকে না-কি চন্দ্রিমা উদ্যানে পাওয়া যায়।

রানু যে হোস্টেলে থাকে সেখানকার কোনো মেয়েই কাজটা করেছে। হোস্টেল থেকেও রানুকে নোটিশ দিয়েছে যেন হোস্টেল ছেড়ে যায়। সে এখন যাবে কোথায়? তার থাকার জায়গা দরকার। টাকা-পয়সা দরকার। রানুর কাছে শুনলাম তুই বাগড়া দিচ্ছিস যেন পল্টু ভাইজান কিডনী না কেনেন। এটা কেমন কথা?

মেয়েটাকে আমি আবার পাঠালাম। তোর দায়িত্ব আজকালের মধ্যে কিডনীর বিষয় ফাইনাল করে আমাকে জানানো। ভাল কোনো ছেলে পাওয়া গেলে আমি নিজ খরচায় মেয়েটার বিয়ে দিতে চাই। তোর সন্ধানে কেউ কি আছে?

আচ্ছা শোন! তোর পাতানো খালার ছেলে বাদলা ঐ ছেলেতো এখনো বিয়ে করে নি। ওর সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায় না?

ইতি

তোর মাজেদা খালা

==

পুনশ্চ ১ : পল্টু ভাইজান না-কি ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খেতে চেয়েছেন। রেঁধে পাঠালাম। উনার কেমন লাগল জানাবি। ঝাল মনে হয় একটু বেশি হয়ে গেছে। এখনকার বাজারে সবই মিষ্টি টাইপ কাঁচামরিচ। এটা যে এত ঝাল, আগে বুঝতে পারি নি।

পুনশ্চ ২ : কি লিখতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পল্টু ভাইজানের শোবার ঘরে আমার ছবিটা কি এখনো ঝুলছে ? এই ছবি যে আমার কিশোরী বয়সের, তা রানুকে বলবি না। সে যদি নিজে থেকে বুঝে ফেলে তাহলে ভিন্ন কথা।

পল্টু স্যারের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জব পার্মানেন্ট। মাঝে মধ্যে মনে হয় ভাল-মন্দ খাবার জন্যে বেঁচে থাকি। নবরত্ন সভার আবুল ফজলের নাম শুনেছ ?'

রানু বলল, 'না।'

'তিনি মোঘল সম্রাট আকবর দ্যা গ্রেটের নয় রত্নের এক রত্ন। তিনি আকবরের একটা জীবনী লিখেছেন, নাম "আইন-ই-আকবরী"। সেখানে সম্রাট আকবর কি কি খেতেন সেই সব লেখা আছে। মরে যাবার আগে তাঁর পছন্দের একটা খাবার খেতে ইচ্ছা করছে। রেসিপিও উনি লিখে গেছেন। রেসিপি বললে রাঁধতে পারবে ?'

'রেসিপি কি ?'

পল্টু স্যার আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'খাবারটার নাম দুনিয়াজা। দশ সের মাংসের সঙ্গে দশ সের পিঁয়াজের রস মিশাতে হবে। এক পোয়া লবণ দিতে হবে। কিছু গোলমরিচের গুঁড়া। তারপর অল্প আঁচে জ্বাল হতে থাকবে।'

'আর কিছু না ?'

'আর কিছুতো লেখা ছিল না।'

রানু বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে খেতে পারবেন বলে মনে হয় না। তেল ঘি ছাড়া কেমন হবে খাবারটা ?'

পল্টু স্যার বললেন, 'পিঁয়াজের রসে রান্নাই এই খাবারের বিশেষত্ব। হিমু বাবুর্চির কাছ থেকে জেনে নাও কি কি লাগবে। আজ রাতে আমি আকবর বাদশা। দুনিয়াজা খাব।'

রানু বলল, 'আমাকে বাবুর্চি ডাকবেন না। আমার নাম রানু। আমাকে রানু ডাকবেন। আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিন যেখানে আমি রাতে থাকব। হোস্টেল থেকে আমার কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে।'

===

বাদল বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব। সব নিয়ে আসব।'

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে কে জানে।

সন্ধ্যা সাতটা। রান্নাঘরে দুনিয়াজা রান্না হচ্ছে। সাহায্যকারী পরামর্শদাতা হচ্ছে বাদল। তার উৎসাহ তুঙ্গস্পর্শী। মনে হচ্ছে রানু বাবুর্চির এসিসটেন্ট হয়ে সে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। একটু পরপর রানুর হাসির শব্দও আসছে। বাদলের হাসির আওয়াজ পাচ্ছি না। দু'জন মানুষের মধ্যে একজন যখন হাসে তখন অন্যজনকেও হাসতে হয়। বাদল হাসছে না কেন বুঝতে পারছি না। দু'জনের কথাবার্তাও ইতোমধ্যেই রহস্যজনক হয়ে আসছে।

রানু : রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? ধোঁয়ায় আপনার কষ্ট হচ্ছে।
বাদল : তোমারও তো কষ্ট হচ্ছে। তুমিতো ধোঁয়া প্রুফ না।
রানু : মেয়েদের আবার ধোঁয়ার কষ্ট!
বাদল : তোমরা মেয়েদের এত ছোট করে দেখ কেন ?
রানু : আপনারাই আমাদের ছোট করে রাখেন।
বাদল : খুবই ভুল কথা বলছ রানী।
রানু : রানী বলছেন কেন ? আমার নাম রানু।
বাদল : সরি, ভুলে রানী বলে ফেলেছি। স্লিপ অব টাং।
রানু : সবার সামনে এ রকম স্লীপ অব টাং যেন না হয়। অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে।
বাদল : অন্য কি ভাববে ?
রানু : ইস্। আপনি বোকা না-কি ? কেন বুঝতে পারছেন না ?
বাদল : রানী, আসলেই বুঝতে পারছি না।
রানু : আবার রানী! শুনুন, প্রেমিকরাই শুধু তাদের প্রেমিকাদের রানী বলে ডাকে কিংবা জানপাখি ডাকে। খুবই হাস্যকর।
বাদল : হাস্যকর কেন হবে ?
রানু : আমার কাছে হাস্যকর।

আমি মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ঘুমুবার আয়োজন করছি— বাদল হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। হাতে মোবাইল টেলিফোন।

'হিমুদা! বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতো! বাবা কিছু না বুঝেই চিৎকার চেঁচামেচি করছে। তুমি পুরো বিষয়টা সুন্দর করে গুছিয়ে বল।'

আমি গম্ভীর গলা বের করলাম, 'হ্যালো।'

খালু সাহেব ধমকে উঠলেন, 'হিমু না।'

'জ্বি।'

==

'এ রকম করে কথা বলছ কেন ? সমস্যা কি ?'

'কোনো সমস্যা নেই।'

'বাদলের ব্যাপারটা কি আমাকে বল। কিছুই লুকাবে না। সে করছে কি ?'

'এই মুহূর্তে সে সন্দেহজনক চরিত্রের এক বাবুর্চি মহিলার এসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করছে পিঁয়াজ কেটে দিচ্ছে এবং নিচু গলায় গল্পগুজব করছে।'

'What ?'

'সত্যি কথা জানতে চাচ্ছেন, সত্যি কথা বললাম। তবে বাবুর্চিটার চেহারা ভাল। চরিত্র সন্দেহজনক হলেও চেহারা খারাপ না।'

'সন্দেহজনক চরিত্র মানে কি ?'

'সন্ধ্যার পর চন্দ্রিমা উদ্যানে কাস্টমারের খোঁজে ঘুরে বলে জনশ্রুতি আছে।'

'বাদল ওর সঙ্গে জুটল কিভাবে ?'

'বলতে চাচ্ছি না, খালু সাহেব।'

'কেন বলতে চাচ্ছ না ?'

'হয়ত ব্যাপারটা আপনি সহজভাবে নিতে পারবেন না।'

'হিমু ঝেড়ে কাশ। ঝেড়ে কাশ বললাম। I order you to caugh.'

'বাদল যে বাসায় পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে সন্দেহজনক চরিত্রের ঐ মেয়েও সেই বাড়িতেই কাজ করে।'

'কি বললে ? বাদল পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে ?'

'জ্বি। মহানন্দে ঘর ঝাট দিচ্ছে। মেঝে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুচছে। আমার ধারণা ছাত্র পড়ানোর মনোটনি কাটানোর জন্যে সে এই কাজ করছে।'

খালু সাহেব টেলিফোনে সিংহনাদ করলেন, 'বাদলকে টেলিফোনটা দাও! আমি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলব।'

আমি বিনীত গলায় বললাম, 'বাদলকে টেলিফোন দিতে হলে আমাকে রান্নাঘরে যেতে হয়। কাজটা করতে চাচ্ছি না। তাদের কি অবস্থায় দেখব কে জানে। বললাম না মেয়েটার চরিত্র সন্দেহজনক।'

'বাদল কোন বাসায় আছে সেই ঠিকানা দাও— আমি আসছি।'

আমি ঠিকানা দিয়ে বললাম, 'আজ না এসে আপনি বরং আগামীকাল সন্ধ্যায় আসুন।'

'আজ এলে সমস্যা কি ?'

==

'আজ বৃহস্পতিবার। আপনার বোতল দিবস। আজ এলে আপনার বোতল দিবসটা মাটি হবে। কাল সন্ধ্যায় আসুন, হাতেনাতে আসামি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান।'

'বাদল কি সত্যি চাকরের কাজ নিয়েছে?'

'জ্বি। তবে পার্ট টাইম কাজ। এটা একটা আশার কথা। খালু সাহেব, বুঝতে পারছি আজ আপনার মন খুবই অশান্ত। এক কাজ করেন, আজ একটু সকাল সকাল ছাদে চলে যান। ওমর খৈয়াম বলেছেন—

'রাখ তোমার ওমর খৈয়াম। আমি কি চীজ, বাদল কাল সন্ধ্যায় জানবে।'

রানু-বাদল কথামালা আবার শুরু হয়েছে। আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি এবং কথা শুনছি।

রানু : জানেন, আমার খুব শখ টিভি নাটকে অভিনয় করা। কিন্তু এত বাজে চেহারা কে আমাকে নেবে বলুন।

বাদল : তোমার চেহারা খারাপ কে বলল?

রানু : সবাই বলে।

বাদল : আমার সামনে বলে দেখুক।

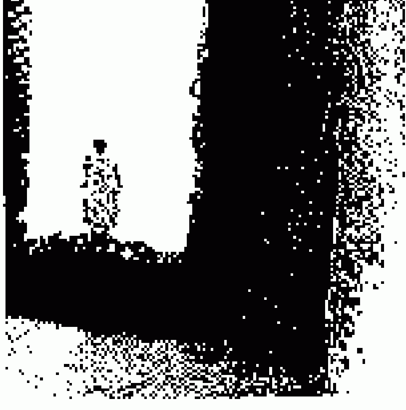
রানু : আপনার সামনে বললে আপনি কি করবেন?

বাদল : আমি ঘুঁসি দিয়ে নাকসা ফাটিয়ে দেবো।

রানু : (হাসি)।

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুঝা যাচ্ছে।

==



লেখকরা আনন্দিত মানুষের বর্ণনা নানানভাবে করেন। কেউ লেখেন— "লোকটা আনন্দে ঝলমল করছে।" কেউ লেখেন— "সে আনন্দে আটখানা।" রবীন্দ্রনাথ লেখেন "বিমলানন্দের চাপা আভায় তাহার মুখমণ্ডলে... ।"

এই মুহূর্তে আমি যাকে দেখছি তার আনন্দ কবি-সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আনন্দে আটখানার জায়গায় আনন্দে এগারোখানা বলতে পারি। তাতেও ইতর-বিশেষ হয় না।

আনন্দিত ভদ্রলোকের নাম আবদুস সাত্তার। ডবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক MC. MR. PL. শেফা ক্লিনিকের কর্ণধার। তিনি বসে আছেন পল্টু স্যারের সামনের বেতের চেয়ারে। তাঁর হাতে হলদিরামের শনপাপড়ির প্যাকেট। সন্দেশ রসগোল্লার মরণঘন্টা সম্ভবত বেজে গেছে। হলদিরাম বাবুরা ঝেঁটিয়ে সব বিদায় করার সংকল্পে নেমেছেন।

সাত্তার সাহেব শনপাপড়ির প্যাকেট পল্টু স্যারের দিকে এগিয়ে বললেন, 'নে, তোর জন্যে এনেছি। ঘিয়ে ভাজা শনপাপড়ি। অমৃতের কাছাকাছি।'

পল্টু স্যার হাত বাড়িয়ে প্যাকেট করা অমৃত নিলেন।

সাত্তার সাহেব বললেন, 'তোর চাকরটাকে বল, প্যাকেট খুলে সুন্দর করে সাজিয়ে মিষ্টি দিতে। ওটার নাম যেন কি কাঞ্চনজঙ্ঘা না?'

'ওর নাম হিমু।'

সাত্তার সাহেব আমাকে ডাকার আগেই আমি ছুটে গেলাম। চাকরদের মত আনাড়ি হাতে প্যাকেট খুলতে গিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট মেঝেতে ফেলে দিলাম। সাত্তার সাহেবের ধমক দেয়ার কথা। ধমক দিলেন না। মধুর গলায় বললেন, 'ভাল আছিস?'

'জ্বি স্যার, ভাল আছি।'

'একটা শনপাপড়ি তুই নিয়ে যা। আরাম করে খা।'

আমি বললাম, 'স্যার, একটা নিলে হবে না। আমরা চারজন। অনুমতি দিলে চার পিস নিয়ে যাই।'

'চারজন মানে কি ?'

'আমি, স্যারের ড্রাইভার, স্যারের বাবুর্চি, পার্ট টাইম ক্লিনার।'

সাত্তার সাহেব চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'টাকা পয়সারতো দেখি হরির লুট হচ্ছে। সব বন্ধ। এখন থেকে পুরো কনট্রোল আমার হাতে। হিমু, তুই যা, কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেতে খেতে আমি বুঝিয়ে বলব, কেন পুরো কনট্রোল আমার হাতে। পল্টু, তুমিও বই পড়া বন্ধ করে আমার কথা শোন। তোমারও শোনা প্রয়োজন।'

আমাদের সবার হাতে হলদিরামের একপিস করে শনপাপড়ি। সাত্তার সাহেবের হাতে চায়ের কাপ। পল্টু স্যারের হাতে একটা বই, নাম— "বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান।" লেখকের নাম প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য। বই পড়ায় বাধা পড়েছে বলে স্যার বিরক্ত। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না বলে আরো বিরক্ত। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতো কম্পাউন্ড বিরক্তি।

সাত্তার সাহেব খাকাড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'এখন আমি একটা সংবাদ দেব। সংবাদটা তোমাদের জন্যে আনন্দেরও হতে পারে, আবার নিরানন্দেরও হতে পারে। সংবাদটা হচ্ছে— পল্টুর বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে কোর্ট একটা অর্ডার জারি করেছে। আমাকে পাওয়ার অব এটর্নি দিয়েছে। পাওয়ার অব এটর্নির ফটোকপি আমার কাছেই আছে। চাইলে দেখতে পার। কেউ দেখতে চাও ? দেখতে চাইলে আওয়াজ দাও।'

আমরা চারজনই একসঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়লাম— দেখতে চাই না। 'পাওয়ার দেখাতে আনন্দ নেই, পাওয়ার না দেখাতেই আনন্দ।'

সাত্তার সাহেব পল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই দেখতে চাস ?'

পল্টু স্যার বললেন, কি দেখতে চাইব ?

'পাওয়ার অব এটর্নি ?'

'খামাখা এসব দেখতে চাইব কি জন্যে ? জরুরি একটা বই পড়ছি।'

'ঠিক আছে, তুই বই পড়তে থাক। আমি চা-টা শেষ করে এদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকি।'

পল্টু স্যার গভীর মনযোগে পাঠ শুরু করলেন। আমি তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম। তিনি পড়ছেন আতা গাছ। আতা গাছ যে বিষাক্ত আমার জানা ছিল না। জানা গেল, ফল ছাড়া এই গাছের সবই বিষাক্ত। একটি বিষাক্ত গাছ মিষ্টি ফল দিচ্ছে, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মানুষের মধ্যেও কি এ রকম আছে ? বিষাক্ত বাবা-মা'র অসাধারণ সন্তান।

সাত্তার সাহেব গলা খাকাড়ি দিয়ে আমার দিকে চোখ ইশারা করলেন। আমি ছুটে গেলাম, তাঁর হাত থেকে চায়ের খালি পেয়ালা নিয়ে গেলাম। তিনি আয়েসী ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাদের স্যার যে মানসিকভাবে পঙ্গু একজন মানুষ, আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা বুঝেছ। হিমু, বল তুমি বুঝেছ ?'

'ইয়েস স্যার।'

'ডাক্তাররা তাঁর বিষয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। ডাক্তারদের সার্টিফিকেট বিষয়ে তোমাদের কোনো কথা আছে ?'

আমি বললাম, 'স্যার, কথা নাই। যে লোক দিনরাত বই পড়ে এবং পায়ে ফ্যানের বাতাস দেয় সে তো মানসিক ভারসাম্যহীন বটেই।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'গুড! তুই ইন্টেলিজেন্ট। তোকে আমার পছন্দ হচ্ছে। শুরুতে বদমাইশ টাইপ মনে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে না।'

আমি ছুটে গিয়ে সাত্তার সাহেবকে কদমবুসি করে ফেললাম। চাকরশ্রেণীদের নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে— প্রশংসাসূচক কিছু শুনলেই অতি দ্রুত কদমবুসি করা তার একটি। সামান্য ধমক দিলে আড়ালে অশ্রু-বর্ষণও নীতিমালার অংশ। আড়ালেরও বিশেষত্ব আছে। আড়ালটা এমন হতে হবে যে যিনি ধমক দিয়েছেন তিনি দেখতে পান।

'হিমু!'

'জ্বি স্যার।'

'তোর স্যারের বিশাল বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে তোরা অবগত আছিস কি-না আমি জানি না। আমার কাছে শুনে রাখ। তার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টই আছে। মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের কাছে এতবড় সম্পত্তি থাকা ঠিক না। দেখা যাবে হঠাৎ উইল করে সে সম্পত্তি লিখে দিল— তার পোষা বিড়ালকে। বা কুকুরকে।'

আমি বললাম, 'স্যারের কোন পোষা কুকুর-বিড়াল নাই।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'আমি কথার কথা বলছি। যাই হোক, এই সমস্ত নানান বিবেচনার প্রেক্ষিতে কোর্ট আমাকে পাওয়ার অব এটর্নি দিয়েছে। তার যাবতীয় বিষয় আমি দেখব। সে ব্যাংকের সঙ্গে কোন রকম লেনদেন করতে পারবে না। যে বিপুল অপচয় সংসারের জন্যে করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। পল্টু কখনো গাড়ি নিয়ে কোথাও যায় না। অকারণে একটা গাড়ি পড়ে আছে। মাসে মাসে ড্রাইভারের বেতন গোনা হচ্ছে। আজ থেকে ড্রাইভার অফ।'

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, এটা আপনি কি বলেন ?'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'কি বলি কানে শুন না ? কানে ঠসা লোক গাড়ি কিভাবে চালাবে ? পেছন থেকে গাড়ি ডাবল হর্ন দিলেও তো কিছু শুনবে না। তোমার চাকরি ডাবল অফ। যাও নিচে যাও। পাওনা বেতন থাকলে মিটিয়ে দেয়া হবে।'

ড্রাইভার নিচে নেমে গেল। সাত্তার সাহেব বাদলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ডিউটি কি ?'

বাদল কিছু বলার আগেই আমি বললাম, 'সে, সে আমার First এসিসটেন্ট।'

'তোর আবার এসিসটেন্টও লাগে ? এসিসটেন্টের চাকরি অফ। নাম কি ? নাম বলে নিচে চলে যা। কি নাম ?'

'বাদল।'

'ঝড় তুফান বৃষ্টি বাদলা এই বাড়িতে চলবে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে রানুর চাকরিও চলে গেল। তাকেও নিচে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়াতে হল।

এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু পল্টু স্যার নির্বিকার। তিনি বিষাক্ত গাছপালা নিয়েই আছেন। এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে সুখি কেউ পৃথিবী নামক গ্রহে আছে তা মনে হচ্ছে না।

আমি সাত্তার সাহেবের কাছে সামান্য এগিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'স্যার, আপনি হিসাবে ভুল করছেন।'

সাত্তার সাহেব খ্যাকখ্যাক করে বললেন, 'আমি হিসাবে ভুল করছি মানে ? কিসের হিসাব ? কিসের ভুল ? তুই আমার ভুল ধরার কে ?'

আমি মাঠে নামলাম। হোমিওপ্যাথ সাহেবের যন্ত্রণা অনেকক্ষণ সহ্য করা গেছে। আর না। এখন যুদ্ধং দেহি।

আমি বললাম, 'তুই তোকারি অনেকক্ষণ ধরে করছিস। আর একবার তুই বললে কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলব। তোকে নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। আজ তুই আন্ডারওয়ার পরে আসিস নাই কেন ? তাহলে আন্ডারওয়ার পরে নামতে পারতি, কিছুটা ইজ্জত রক্ষা হতো।'

সাত্তার সাহেব হঠাৎ গভীর জলে পড়ে গেলেন। তাঁর মস্তিষ্ক খানিকটা জট পাকিয়ে গেল। চাকরশ্রেণীর একজন এমন কথা কিভাবে বলছে— মস্তিষ্ক তার লজিক খুঁজছে। লজিক দ্রুত খুঁজে না পেলে কম্পিউটারের মতো সিস্টেম হ্যাংগ করবে। সাত্তার সাহেব ঘামতে শুরু করেছেন। তাঁর চোখ লাল। হ্যাংগ হবার দিকেই তিনি যাচ্ছেন।

আমি এবার তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। তাঁর মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করার জন্যে বললাম, 'তোকে দেখে মনে হয় তুই ইন্টেলিজেন্ট লোক। তোর সঙ্গে কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। আমাকে চিনতে পারিস নাই ? আমি CID-র লোক। আমাকে রাখা হয়েছে যেন আমি পল্টু সাহেবের কোনো বিপদ হয় কি-না সেটা দেখার জন্যে। বিশ্বাস হয় ?'

সাত্তার সাহেব হা করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ব্রেইন এখনো 'হ্যাংগ' অবস্থায় আছে। আমি বললাম, 'একটা কাজ করলেই তুই বিশ্বাস করবি। দ্বিতীয় প্রশ্ন আর মাথায় আসবে না।'

আমি কথা শেষ করেই বাঁ হাতে আচমকা এক চড় বসিয়ে দিলাম। সাত্তার সাহেব চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন। অস্ফুট শব্দও করলেন— 'ও খোদা রে!'

পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কি হচ্ছে ?'

আমি বললাম, 'কিছুই হচ্ছে না স্যার, সামান্য আর্গুমেন্ট।'

'আর্গুমেন্ট বাইরে গিয়ে কর। তোমাদের যন্ত্রণায় পড়তেও পারছি না।'

আমি সাত্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বললাম, 'স্যার, চলুন, আমরা বসার ঘরে যাই। নিজেদের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে তার সমাধান করি। রুদ্ধ দ্বার বৈঠক।'

সাত্তার সাহেব নিঃশব্দে বসার ঘরে চলে গেলেন। তিনি এখনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখায় আছেন। এখান থেকে বের হতে তাঁর সময় লাগবে।

বসার ঘরে আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে আছি। সাত্তার সাহেব কিছু বলার পরিকল্পনা নিয়ে কয়েকবার গলা খাকাড়ি দিলেন। কিছু বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, 'ইচ্ছা করলে আমার বিষয়ে CID অফিসে খোঁজ নিতে পারিস। হায়ার লেভেলে খোঁজ নিতে যাবি। বলবি সিরাজুল ইসলাম নাম। হিমু আমার ছদ্মনাম।'

সাত্তার সাহেব বললেন, 'আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। আপনি পুলিশের লোক হোন আর যেই হোন, আমি কোর্টের অর্ডার নিয়ে এসেছি। দু'জন ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে যে পল্টু পাগল। একজন হলেন প্রফেসর কেরামত আলি, এসোসিয়েট প্রফেসর অব সাইকিয়াট্রি।'

আমি বললাম, 'পয়সা দিলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। দু'জন ডাক্তার বলেছে পল্টু স্যার পাগল। দশজন বলবে পাগল না। হাইকোর্টে আপিল হবে। উল্টা মামলা হবে যে, সুস্থ মানুষকে পাগল সাজিয়ে সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র।'

==

'মামলা মোকদ্দমা আমি ভয় পাই না।'

'ভয় না পাওয়া ভাল। আমি একটা প্রস্তাব দেই ?'

'কি প্রস্তাব ?'

আমি কিছুক্ষণ শীতল চোখে তাকিয়ে তুই থেকে আপনিতে উঠে এলাম। গলার স্বর নিচু করে বললাম, 'আমাকে দলে নিন। পল্টু স্যারের সম্পত্তির পার্সেন্টেজের বিনিময়ে আমি আপনার হয়ে কাজ করব।'

'কত পার্সেন্টেজ ?'

'আপনিই বলুন কত। গুরুত্ব বুঝে বলবেন।'

সাত্তার সাহেব চুপ করে আছেন। বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধায় পড়ারই কথা। আমি বললাম, 'বাসায় যান। বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন। আমার নিজের প্রস্তাব হল ফিফটি-ফিফটি। যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকেন কিসলুকে দিয়ে একটা শাদা গোলাপের তোড়া পাঠাবেন। শাদা হচ্ছে সন্ধির প্রতীক।'

'কিসলুটা কে ?'

'আমি বললাম, 'নাম শুনে মনে হল আকাশ থেকে পড়েছেন। কিসলু আপনার ছেলের বন্ধু। একটা পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পিস্তলের যে গুলি আছে সেটা পিস্তলে ফিট করে না। চিনেছেন ?'

'হুঁ।'

'চা খাবেন ?'

'না।'

'পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করুন। একটা আপনি হাতে নিন, একটা আমার হাতে দিন। সিগারেটের রঙ শাদা। দু'জন দু'জনকে শাদা লাঠি দেখাচ্ছি। তার মানে কি বুঝতে পারছেন ? শান্তির চেষ্টা।'

সাত্তার সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। ভদ্রলোকের ব্রেইন এখনো পুরোপুরি কাজ করছে না।

আমি সিগারেট উঁচু করে বললাম, 'শান্তি। শান্তি। শান্তি।'

সাত্তার সাহেবও বিড়বিড় করে বললেন, 'শান্তি শান্তি।' আমি বললাম, 'আপনি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ুন। আপনি যেখানে ধোঁয়া ছাড়বেন আমিও সেখানে ধোঁয়া ছাড়ব। মানুষ শান্তির পতাকা উড়ায়, আমরা উড়াব শান্তির ধোঁয়া। ঠিক আছে ?'

'হুঁ।'

==

শান্তির ধোঁয়া উড়ানো হল। শান্তির ধোঁয়া উড়িয়ে সাত্তার সাহেব আরো জবুথবু হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'বাসায় চলে যান। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে লম্বা ঘুম দিন। মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার ঘুম দরকার।'

'হুঁ।'

'একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারবেন, না-কি আমার সাহায্য লাগবে?'

'একা নামতে পারব।'

'গুড। তাহলে বিদায়। মনে রাখবেন, আমার অফার ফিফটি-ফিফটি।'

অল কোয়ায়েট অন দি ইস্টার্ন ফ্রন্ট। ভুল বললাম, সব ফ্রন্টেই শান্তি। ঘরের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে আবার শুরু হয়েছে। রানু রান্না শুরু করেছে। বাদল আছে সহকারী।

আজকের মেনু—

চিংড়ি মাছ দিয়ে করলা।
মলা মাছের চচ্চড়ি।
কুমড়া ফুলের বড়া।
চিতল মাছের পাদা দিয়ে কোপ্তা।

স্ট্যান্ড বাই আইটেম খাসির কলিজা ভুনা।
কলিজা মশলা মাখিয়ে রেডি করা। সময় পাওয়া গেলে রান্না হবে। সময় পাওয়া না গেলে রান্না হবে না। বলতে ভুলে গেছি, বিশেষ ধরনের চাল আজ প্রথম রান্না হবে। চালের নাম বাঁশফুল। চালটা দেখতে মোটা। রান্না হলে চিকন হয়ে যায়। বাঁশ গাছের ফুল ফুটলে যেমন গন্ধ ছড়ায় সে রকম গন্ধ আসে।

পল্টু স্যারের বিষাক্ত গাছপালার পাঠ শেষ হয়েছে। এখন তিনি পড়ছেন— মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা বই তবকত-ই-নাসিরি। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ। এ ধরনের বইপত্র তিনি কোত্থেকে যোগাড় করেন তাও এক রহস্য।

আমার হাতে কোনো কাজ নাই। আমি বারান্দায় বসে ঝিমাচ্ছি। ঝিমুনি হল নিদ্রার আগের অবস্থা। এই অবস্থায় কনশাস এবং সাব-কনশাস দুটিই কিছু পরিমাণে জাগ্রত থাকে বলে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেন্ডেলিফ পেরিওডিক টেবিল চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক কেকুলে বেনজিনের গঠন দেখতে পেয়েছিলেন। আমি তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে রান্নাঘরে বাদল এবং রানু কি

==

বলাবলি করছে তা শুনতে পারছি। প্রতিটি বাক্যের আলাদা অর্থও বুঝতে পারছি। যেমন বাদল বলল, 'চামচের স্টান্ডার্ট ঠিক না। আরো লম্বা চামচ হওয়া উচিত। তাহলে আর তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ত না।' (গূঢ় অর্থ– তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ছে। আমার খারাপ লাগছে।)

রানু বলল, 'রান্না করতে গেলে একটু-আধটু তেলের ছিটা খেতে হয়। আপনি এত কাছে থাকবেন না, আপনার গায়ে লাগবে। (গূঢ় অর্থ— ওগো, গরম তেল আমার গায়ে লাগে লাগুক, তোমার গায়ে যেন না লাগে।)

বাদল বলল, কড়াইয়ের সবটা তেল যদি আমার গায়ে পড়ে তাহলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকব। (গূঢ় অর্থ— তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।)

রানু বলল, 'হাত ধরে থাকলে আমি নাড়ানাড়ি করব কিভাবে ?' আপনিতো ভাল পাগল! (গূঢ় অর্থ— প্রহর শেষের আলোয় রাঙা, সেদিন চৈত্র মাস। তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ!)

মঞ্চ নাটকে কি হয় ? অতি আবেগঘন মুহূর্তে ভিলেনের প্রবেশ ঘটে। নাটকের ভাষায় ক্লাইমেক্স তৈরি হয়।

ক্লাইমেক্স তৈরি হয়ে গেল। ভিলেন হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করলেন বাদলের বাবা, আমার শ্রদ্ধেয় খালু সাহেব। আমি আদবের সঙ্গে তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে বসালাম। ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপা গলায় বললাম, 'যা বলবেন, ফিসফিস করে বলবেন। এই বাড়িতে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া পাগল বাস করেন। তিনি এখন বই পড়ছেন। তাঁর পাঠে বিঘ্ন হলে কি করে বসবেন ঠিক নেই। উঁকি দিলেই পাগল দেখতে পাবেন।'

খালু সাহেব উঁকি দিয়ে পাগল দেখে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছে না-কি ?

আমি বললাম, 'হুঁ। একটু পরেই মুরগির মতো কক কক করবে ?'

'কেন ?'

'উনি কক কক ধর্মী মানুষ।'

'তার মানে কি ?'

'মানে এখনো পুরোপুরি বের হয় নি।'

'বাদল এই পাগলের সাথে বাস করছে ?'

'হুঁ।'

'এখন সে কোথায় ?'

আমি বললাম, 'রান্নাঘরে।'

==

'রান্নাঘরে আর কে আছে ? চন্দ্রিমা উদ্যানের মেয়েটা আছে ?'

'হুঁ।'

'বাদলকে ডেকে আন। তাকে বলবে যে আমি আমার লাইসেন্স করা পিস্তল সঙ্গে করে এনেছি। খুনাখুনি ঘটে যাবে।'

'পিস্তল সত্যি এনেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'গুলি সাবধানে করবেন। আপনার হাতের টিপ কেমন জানি না। গুলি করলেন বাদলকে, লাগল আমার গায়ে। বিনা দোষে বেহেশতে গিয়ে বসে রইলাম। সত্তুরটা পরী কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। এ বলে আমার দিকে তাকাও, ও বলে আমার দিকে তাকাও।'

'কথা বাড়াবে না। বাদলকে ডেকে আন।'

আমি বাদলের সন্ধানে রান্নাঘরে ঢুকলাম। বাদলকে ঘটনা খুলে বললাম। রানু বলল, 'কি সর্বনাশ! উনি সত্যি পিস্তল নিয়ে চলে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ। এসেছেন এবং তাঁর হাতের টিপ খুবই খারাপ। বাদল একা যে বিপদে আছে তা না। আমরা সবাই বিপদে।'

বাদল বলল, 'আমি কি করব সেটা বল। ফায়ার স্কেপ দিয়ে পালিয়ে যাব ?'

'না। তুই এক কাজ কর। খালু সাহেবের রাগটা আরো বাড়িয়ে দে। মানুষ অধিক শোকে পাথর হয়। অধিক রাগে হয় কংক্রিট। এমন ব্যবস্থা কর যেন তিনি রেগে কংক্রিট হয়ে যান।'

'কিভাবে রাগাব ?'

তুই খালু সাহেবকে গিয়ে বল, 'বাবা, আমি ঐ মেয়েটাকে আজ ভোরবেলায় বিয়ে করে ফেলেছি। কোর্টে বিয়ে হয়েছে। এক লাখ এক টাকা কাবিন।'

'মিথ্যা কথা বলব ?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে।'

বাদল বলল, 'এই মিথ্যাতেই হবে ?'

'হওয়ারতো কথা। রাগের একটা লিমিট আছে। লিমিট ক্রস করে যাবার পর শূন্যতা।'

বাদল রানুর দিকে তাকাল।

রানু বলল, 'উনি যা বলতে বলছেন তাই বল।'

এরা যে দু'জনই তুমি লেভেলে নেমে এসেছে তা আগেই শুনেছি। তুমি যে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তা জানলাম। রানুর চোখে-মুখে নববিবাহিতা স্ত্রী সুলভ লজ্জা এবং আনন্দ।

==

বাদল বলল, 'ভয় লাগছে, হিমুদা।'

রানু বলল, 'ভয়ের কি আছে ? আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

বাদল বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে লাভটা কি হবে ?'

রানু বলল, 'তুমি সাহস পাবে।'

'আমি সাহস পাব কেন ? তুমি কি সাহসের দোকান খুলেছ ?'

রানু বলল, 'ঝগড়া করছ কেন ?'

বাদল বলল, 'ঝগড়াতো তুমি করছ।'

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়ায় নাক গলানো যায়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় না। এরা বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মত ঝগড়া করছে। কাজেই নাক গলানো ঠিক হবে না। ঝগড়া-টগরা করে তারা একটা সিদ্ধান্তে আসুক, তারপর দেখা যাবে। আমি খালু সাহেবের কাছে চলে এলাম।

খালু সাহেব, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির মতো চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে বসে আছেন। তাঁকে দেখাচ্ছেও মূর্তির মতো। নাক, মুখ শক্ত। চোখের দৃষ্টি স্থির। জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির সঙ্গে তাঁর সামান্য অমিল আছে। কারণ তাঁর হাতে খোলা পিস্তল।

পল্টু স্যার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে ভীত মনে হচ্ছে। তাঁর হাতে এখন অন্য বই— একশ এক ইলিশ রান্না। তবকত-ই-নাসিরি সম্ভবত পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। তিনি ঘণ্টায় একশ দশ কিলোমিটার টাইপ পাঠক। এই মুহূর্তে পল্টু স্যারের কক কক ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কক কক করছেন। যতবারই করছেন ততবারই খালু সাহেব খানিকটা কেঁপে উঠছেন।

পল্টু স্যার বললেন, 'আপনি পিস্তল হাতে বসে আছেন কেন জানতে পারি ?'

খালু সাহেব বললেন, 'আমার ছেলে এক্ষুণি রান্নাঘর থেকে বের হবে, তাকে গুলি করব।'

'কেন ?'

'সে একটা অতি সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে বিয়ে করে বসে আছে, এই জন্যে।'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমাদের সবার চরিত্রইতো সন্দেহজনক। শুধুমাত্র পশু পাখি মাছ এদের চরিত্র সন্দেহজনক না। এরা কি করবে, কি করবে না তা আমরা জানি। হোমোসেপিয়ানদের ব্যাপারে এই কথাটা বলা যাচ্ছে না।'

খালু সাহেব বললেন, 'আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

পল্টু স্যার বললেন, 'আমি কাউকে বিরক্ত করছি না। আপনি বিরক্ত করছেন। আমার পাঠে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। শান্তিমতো বই পড়তে দিচ্ছেন না। কক কক কক।'

'কক কক করছেন কেন ?'

'আপনি বক বক করছেন, এই জন্যে আমি কক কক করছি। আমাকে শান্তিমত বই পড়তে দিন।'

খালু সাহেব বললেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনাখুনি পর্ব শেষ হবে— আপনি শান্তিমতো বই পড়তে পারবেন।'

পল্টু স্যার বললেন, 'গুলির শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। খুব ছোটবেলায় নানাজানের সঙ্গে পাখি শিকারে গিয়েছিলাম। গুলির শব্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কক কক কক।'

খালু সাহেব বললেন, 'আপনি কানে হাত দিয়ে রাখুন।'

বাধ্য ছেলের মতো পল্টু স্যার কানে হাত চেপে রাখলেন। বাম কান বাঁ হাতে চেপে ধরা। ডান কান ইলিশ মাছের বই দিয়ে চেপে ধরা। আমাদের সবার দৃষ্টি রান্নাঘরের দরজার দিকে। রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রস্তুত। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ফিল্মের কোনো দৃশ্য হলে এখানে ধ্বক ধ্বক টাইপ মিউজিক দেয়া হতো। ধ্বক ধ্বক হচ্ছে হার্টের শব্দ।

রান্নাঘর থেকে কেউ বের হল না। বসার ঘরের দরজা দিয়ে এক গাদা পুলিশ ঢুকে পড়ল। তারা আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। আমি CID পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছি।

সাধারণ নিয়মে এক ঢিলে দুই পাখি পাওয়া যায়। এখানে পুলিশ এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি পেয়ে গেল। একজন অস্ত্রধারী পেল। খালু সাহেব। বাদলকে পেল, রানুকে পেল।

পল্টু স্যারকে তারা কিছু বলল না। পল্টু স্যার নির্বিকার ভঙ্গিতে ইলিশ মাছের বই পড়া শুরু করলেন। এত কিছু যে ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই, তিনি পড়ছেন— "ইলিশ আনারস।"

ফলের মধ্যে শুধু আনারস দিয়ে ইলিশ রান্না হয় কেন বুঝলাম না। অন্য ফলগুলো কি দোষ করল ?

আম ইলিশ।

কালোজাম ইলিশ।

সাগর কলা ইলিশ।

বিদেশী ফল দিয়েও রান্নার চেষ্টা করা যেতে পারে যেমন আপেল ইলিশ, আঙুর ইলিশ। ইলিশ রান্নাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

==

পুলিশের গাড়িতে উঠার সময় দেখলাম সাত্তার সাহেবকে। গ্রেফতার নাটক দেখার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তাঁর হাতে পাইপ। চোখে সানগ্লাস। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় ডাকলাম, 'সাত্তার ভাই!'

তিনি চমকালেন। আমার দিকে তাকালেন কি-না তা সানগ্লাস চোখে থাকার কারণে বুঝা গেল না। আমি বললাম, 'কক কক কক।'

সাত্তার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'তুই এসব কি বলছিস?'

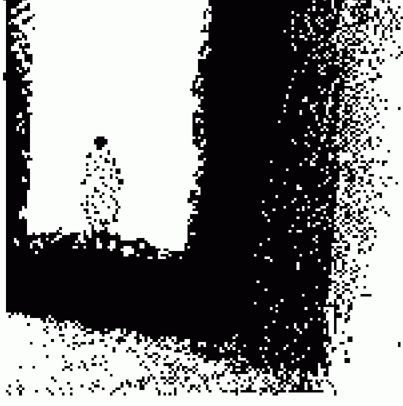
আমি বললাম, 'কক কক বলছি।'

আমাকে অনুকরণ করা বাদলের দীর্ঘ দিনের স্বভাব। সেও বলল, 'কক কক কক।'

এই মুহূর্তে বাদলের অতি ঘনিষ্ঠজন রানু। সে বাদলের অনুকরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। সে মিষ্টি গলায় বলল, 'কক কক কক।'

আমরা কক কক করতে করতে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম।

==



পারিবারিকভাবেই আমরা থানা-হাজত দখল করে আছি। রানুও আমাদের সঙ্গে আছে। মেয়ে হাজতীদের জন্যে আলাদা হাজত আছে। জানা গেছে সেখানে এক হাজতী না-কি হেগে-মুতে সর্বনাশ করে রেখেছে। মেথর আনতে লোক গেছে। মেথর সব পরিষ্কার করবে তখন রানুকে সেখানে ট্রান্সফার করা হবে।

আমাদের হাজতে বাইরের লোক বলতে চার ফুট হাইটের একজন আছে। প্রচণ্ড গরমেও তার গায়ে চাদর। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে একটু পরপর থুথু ফেলছে এবং সেই থুথু তর্জনি দিয়ে মেঝেতে ঘসছে। খালু সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'লোকটা এমন করছে কেন ?'

আমি বললাম, সে থু থু দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে।

'কেন ?'

'পানি পাবে কোথায় যে পানি দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করবে ? থুথুই ভরসা।'

'পাগল নাতো ?'

'সম্ভাবনা আছে। আবার হেরোইনচিও হতে পারে।'

'হেরোইনচি কি ?'

'এরা হেরোইন খায়। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব ?'

'আরে না। হিমু! আজ যে আমাকে এমন একটা কারেক্টারের সঙ্গে হাজতে বসে থাকতে হচ্ছে তার মূলে আছ তুমি।'

আমি বললাম, 'কথাটা ঠিক না খালু সাহেব! আপনি অস্ত্র হাতে ধরা পড়েছেন।'

খালু সাহেব বললেন, 'এটা আমার লাইসেন্স করা পিস্তল। অস্ত্র হাতে ধরা পড়েছি বলছ কেন ?'

আমি বললাম, 'খুনের উদ্দেশ্যে আপনি অস্ত্র হাতে বসেছিলেন। এটেম্পট টু মার্ডার। এখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই।'

রানু বলল, 'অবশ্যই ভূমিকা আছে। আপনার কারণেই বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনি না থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাদল থাকতো তার জায়গায় আমি থাকতাম আমার জায়গায়। উনিও পিস্তল হাতে আসতেন না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেন না।'

খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, তুমি কি বল ?'

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, 'চেহারাও সুন্দর। বুদ্ধি এবং রূপ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বাদলটার দিকে তাকিয়ে দেখ— রূপ আছে। বুদ্ধি এক ছটাকও নেই। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত ?'

'একমত।'

'তুমিতো অনেকবার হাজতে থেকেছ। হাজত থেকে বের হবার বুদ্ধি কি ?'

আমি বললাম, 'গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে টেলিফোন করতে হবে, এরা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয়-স্বজনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করুন।'

রানু বলল, 'এই কাজ কখনো করা যাবে না। কাউকে জানানো যাবে না। পুলিশ আমাদের ধরে হাজতে রেখেছে এটা জানলে বিরাট সমস্যা হবে।'

খালু সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'মেয়েটাকে যতটুকু বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম, এ তারচেয়েও বুদ্ধিমতী। আই এ্যাম ইমপ্রেসড। মেয়েটার উপর থেকে রাগ দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। কি করি বলতো!'

'রাগ ধরে রাখতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটা কি কথা বলছে তা শুনবেন না। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। আপনি থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকুন।'

খালু সাহেব থুথুওয়ালার দিকে তাকাতেই থুথুওয়ালা বলল, 'স্যার, স্লামালিকুম।'

খালু সাহেব ভীত গলায় বললেন, 'ওয়ালাইকুম সালাম।'

থুথুওয়ালা বলল, 'পুডিং খাইবেন ?'

খালু সাহেব বললেন, 'পুডিং খাব মানে কি ? কিসের পুডিং ?'

'রক্তের পুডিং।'

থুথুওয়ালা বসে বসে খালু সাহেবের দিকে এগুচ্ছে। খালু সাহেব আতংকে অস্থির। থুথুওয়ালা বলল, 'এক গামলা টাটকা গরম রক্ত নিবেন।

তার মধ্যে লবণ দিবেন, বাটা লাল মরিচ দিয়া ঘুটবেন। অতঃপর ঠাণ্ডা জায়গায় রাখবেন। জমাট বাইন্ধা পুডিং হয়ে যাবে। চাইলের আটার রুটি দিয়া খাইবেন। বিরাট স্বাদ।'

রানু থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'যেখানে ছিলে সেখানে যাও। আজেবাজে কথা বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না। আমরা ভয় খাওয়ার লোক না। আর একটা শব্দ করেছ কি থাবড়ায়ে তোমার দাঁত ফেলে দিব। জন্মের মতো রক্তের পুডিং খাওয়া গুছায়ে দেব। বদমাস কোথাকার।'

থুথুওয়ালা ভয় খেয়েছে। সে তার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'বাদল গাধাটা যে এমন অসাধারণ একটা মেয়েকে পছন্দ করেছে, শুধুমাত্র এই কারণে এ জীবনে সে যত অপরাধ করেছে সব ক্ষমা করে দিলাম।'

আমি বললাম, 'পছন্দে লাভ হবে না। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। এ রকম মেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।'

খালু সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'বাদলের উপর ভরসা করা যায় না। কোনো একটা গাধামি করবে। মেয়ে বলবে সব অফ।'

আমি বললাম, 'মেয়েটার 'অফ' বলার সম্ভাবনা আছে।'

খালু সাহেব গলা আরো নামিয়ে বললেন, 'মেয়েটা যদি একবার টের পেয়ে যায় বাদল কত বড় গাধা তাহলে সে কি আর তাকে বিয়ে করবে? না-কি করা উচিত?'

'করা উচিত না।'

'এখন আমাদের কি করা উচিত সেটা বল।'

'এই দু'জনের বিয়ের ব্যবস্থা করা। বাই হুক্ক অর বাই কুক্ক।'

'এর মানে কি?'

'এর মানে যে কোনো মূল্যে বিবাহ। প্রয়োজনে হাজতেই কর্ম সমাধান করতে হবে। ওসি সাহেব হবেন সাক্ষী। আর আপনি এখন থেকেই বৌমা ডাকা শুরু করে দিন। কাজ এগিয়ে থাকুক।

থুথুওয়ালা আবার খালু সাহেবের দিকে এগুচ্ছে। খালু সাহেব রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বৌমা তুমি আমার পাশে এসে বসতো!' রানুর মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। আর তখনি হাজতের দরজা খুলল। খালু সাহেব, রানু এবং বাদল ছাড়া পেয়ে গেল। আটকা পড়লাম আমি। থুথুওয়ালা খিকখিক করে হাসছে। সে এত মজা পাচ্ছে কেন কে জানে?

ধানমন্ডি থানার OC সাহেবের সামনে আমি বসে আছি। এই OC সাহেব নতুন এসেছেন। তাঁকে আমি আগে দেখিনি। ভদ্রলোককে মোটেই

==

পুলিশ অফিসারের মতো লাগছে না। রোগা এবং অতিরিক্ত ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পুলিশের পোশাক নেই। গোলাপি রঙের হাফসার্ট পরেছেন। প্যান্ট কি পরেছেন দেখতে পারছি না। গোপালি রঙের সার্টের কারণে তাঁর চেহারায় বালক বালক ভাব এসেছে। গোলাপি না-কি মেয়েদের রঙ। কথা সত্যি হতে পারে।

ওসি সাহেবের সামনে একটা হাফ প্লেটে পান সাজানো। তিনি পান মুখে দিলেন। আয়েশ করে কিছুক্ষণ পান চিবানোর পর ঘন ঘন হেঁচকি তুলতে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'সিগারেট ছাড়ার জন্যে পান ধরেছি কিন্তু জর্দাটা সহ্য হচ্ছে না। আগে দুই প্যাকেট সিগারেট খেতাম। চল্লিশ স্টিক।'

আমি খানিকটা বিস্মিত হচ্ছি। ওসি সাহেবকে মনে হচ্ছে কৈফিয়ত দিচ্ছেন। অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়া আসামীকে কোনো পুলিশ অফিসার কৈফিয়ত দেয় না।

'আপনার নামতো হিমু ?'

'জ্বি স্যার।'

'হিমালয় থেকে হিমু ?'

'জ্বি স্যার।'

'রূপা নামের কাউকে চেনেন ?'

'জ্বি স্যার।'

ওসি সাহেব আরেকটা পান মুখে দিলেন। যথারীতি নতুন করে হেঁচকি শুরু হল। তিনি হেঁচকি দিতে দিতে টেলিফোনের বোতাম টিপছেন। একেকবার হেঁচকি দিচ্ছেন, একেকবার বোতাম টিপছেন। ব্যাপারটা যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং। ওসি সাহেবের টেলিফোনের বোতাম টেপা শেষ হল। তিনি টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কথা বলুন।'

আমি বললাম, 'কার সঙ্গে কথা বলব ?'

ওসি সাহেব বললেন, 'হ্যালো বললেই বুঝতে পারবেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। বলুন হ্যালো।'

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে রূপার গলা শোনা গেল। রূপা বলল, 'কেমন আছ ?'

'ভাল।'

'কতদিন পর তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে জান ?'

'তিন বছর ?'

==

'না। দুই বছর চার মাস। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে ধরতে। ধরতে পারি নি। শেষে বাধ্য হয়ে ঢাকার সব ক'টা থানায় বলে রেখেছি— হিমু নামের একজন পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে থানায় আসবে। তখন যেন আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়। এবার কি কারণে এ্যারেস্ট হয়েছ ?'

'পুলিশের CID পরিচয় দিয়ে ধরা খেয়েছি।'

'এখন তোমাকে পুলিশ সাজতে হচ্ছে ?'

'হুঁ। একে কি বলে জান ? একে বলে একই অঙ্গে কত রূপ।'

'প্লিজ হেঁয়ালি না। স্বাভাবিকভাবে কথা বল। সাধারণ একটা কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'ঠিক আছে, সাধারণ কথা বলছি। রান্নার একটা রেসিপি বলি ? রক্তের পুডিং কি করে রান্না করতে হয় জান ? প্রথমে এক গামলা গরম রক্ত নেবে। তারপর...'

'হিমু! কেন এ রকম করছ ?'

'সরি।'

'তোমার জন্যে বড় একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'বল শুনি।'

'টেলিফোনে বলব না। তুমি আমার সামনে বসবে, তারপর বলব। সারপ্রাইজ পাবার পর তোমার মুখের কি অবস্থা হয় দেখব। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর সরাসরি আমার কাছে আসবে। ঠিক আছে ?'

'হুঁ।'

'হুঁ না। বল— আমি আসব।'

'আমি আসব।'

'গুড বয়। এখন বল আমি আজ যে শাড়িটা পরে আছি তার রঙ কি ?'

'গোলাপি।'

'আশ্চর্যতো। গোলাপি আমার পছন্দের রঙ না। আজই কি মনে করে যেন পরেছি। কিভাবে বললে ?'

'ওসি সাহেব গোলাপি রঙের সার্ট পরেছেন, সেই থেকে মনে হল তুমিও গোলাপি রঙ পরেছ।'

রূপা বিরক্ত গলায় বলল, 'ওসি সাহেবের সার্টের সঙ্গে আমার শাড়ির রঙের কি সম্পর্ক ?'

আমি জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ওসি সাহেবের হেঁচকি থেমেছে। তিনি পানের প্লেটের দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হয় আরেকটা পান মুখে দেবেন।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'আপনিতো বিখ্যাত মানুষ!'

'জানি না স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার প্রয়োজন নেই। আমি সামান্য পুলিশ অফিসার, আপনার মত কেউ না। এই থানার আগের ওসি সাহেবকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় তিনি বলেছেন, আপনার থানায় হিমু নামের কাউকে যদি গ্রেফতার করে আনা হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব যত্ন করবেন। ওসি সাহেবের নাম কামরুল। চিনেছেন ?'

'জ্বি না।'

'পুলিশের আইজি সাহেব একদিন থানা ইন্সপেকশনে এসেছিলেন। তিনিও হঠাৎ করে বললেন, হিমু নামের কেউ কখনো এ্যারেস্ট হলে তাঁকে যেন জানানো হয়।'

'জানিয়েছেন ?'

'না। স্যার এখন কুয়ালালামপুরে। ইন্টারপোলের এক মিটিং-এ গেছেন। চা খাবেন ?'

'খাব।'

ওসি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চা আমার খুব পছন্দের পানীয় ছিল। সারা দিনে বিশ কাপ চা খেতাম। প্রতি কাপ চায়ের সঙ্গে একটা করে সিগারেট। বিশটা সিগারেট দিনে আর বিশটা রাতে। ইন টোটাল ফর্টি স্টিকস। আলাউদ্দিন এন্ড ফর্টি রবারস। এখন হিমু সাহেব বলুন, আপনাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? 'জানি না' এই বাক্যটা বলবেন না। অবশ্যই জানেন। চা খেতে খেতে বলুন।'

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'অনেকের ধারণা আমার কিছু আদিভৌতিক ক্ষমতা আছে।'

'আদিভৌতিক মানে কি সুপার ন্যাচারাল ?'

'হুঁ।'

'আপনার কি সত্যি আছে তেমন কোনো ক্ষমতা ?'

'জানি না।'

'সত্যি জানেন না ?'

'না।'

ওসি সাহেব আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, 'আপনি, আপনার আদিভৌতিক ক্ষমতা দিয়ে আমার বিষয়ে কি কিছু বলতে পারবেন ?'

আমি বললাম, 'আজ আপনার বিবাহ বার্ষিকী। এই উপলক্ষেই আপনার স্ত্রী আপনাকে গোলাপি হাফসার্ট উপহার দিয়েছেন। বিবাহ বার্ষিকীর দিন থেকে সিগারেট ছেড়ে দিবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজই আপনার সিগারেট ছাড়ার প্রথম দিন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আবার সিগারেট ধরবেন।'

ওসি সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তা ঠিক তবে যে কোনো বুদ্ধিমান লোক অবজারবেশন থেকে কথাগুলো বলতে পারে। আপনিই বলুন পারে না ?'

'পারে।'

'আচ্ছা আমার স্ত্রীর নাম কি বলতে পারবেন ? আমার স্ত্রীর নাম যদি বলতে পারেন তাহলে বুঝব আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।'

'আপনার স্ত্রীর নাম আমি বলতে পারব না তবে আপনার স্ত্রীর নামের মধ্যে ধাতব শব্দ আছে। সুরেলা ধাতব আওয়াজ। আপনার স্ত্রীর নাম কি ?'

'নূপুর!'

ওসি সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট ধরালেন। লম্বা টান দিয়ে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। এখন তিনি একবার সিগারেটের দিকে তাকাচ্ছেন, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বিস্মিত মানুষ দেখতে ভাল লাগে। ওসি সাহেবকে দেখতে ভাল লাগছে। ভদ্রলোক হাতের সিগারেট ফেলে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু ফেলতে পারছেন না।

রাত নয়টায় সব ঝামেলা চুকিয়ে আমি থানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। রাস্তায় এক হাঁটু পানি। ওসি সাহেব বললেন, 'পুলিশের গাড়ি দিচ্ছি আপনি যেখানে যেতে চান, নামিয়ে দেব। আমি সঙ্গে যাব। বলুন কোথায় যাবেন ? আমার বাসায় যাবেন ? রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন। কিছু বন্ধু-বান্ধবকে আসতে বলেছি। বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে নূপুর নিজে রাঁধবে। ওর রান্নার হাত ভাল। যাবেন ?'

'যাব। পথে দু'টা জায়গায় যেতে হবে। এক মিনিট করে লাগবে।'

'কোনো সমস্যা নেই। জিপে উঠুন।'

==

পুলিশের গাড়ি প্রথম থামল সাত্তার সাহেবের হোমিও ফার্মেসীতে। সাত্তার সাহেব ফার্মেসী বন্ধ করছিলেন। পুলিশের গাড়ি দেখে চমকে উঠলেন। গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে আরো চমকালেন।

আমি বললাম, 'সাত্তার সাহেব, আমি যে পুলিশের লোক এটা আশা করি এখন বুঝতে পারছেন। পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘুরছি।'

সাত্তার সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'পুলিশকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। পুলিশ যখন বলেছে আমি CID-র কেউ না। তখনই আপনার বুঝা উচিত ছিল। যাই হোক এখন আপনি প্রফেসর কেরামত আলির বাসার ঠিকানা দিন। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপার আছে।'

'উনার বাসার ঠিকানা আমি জানব কিভাবে?'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'কেরামত আলি সাহেবের সঙ্গে আপনার ডিল হয়েছে উনার বাসায়। অবশ্যই আপনি বাসা চেনেন। ঠিকানা দিন। পুলিশি থাবড়া খাবার আগেই দিয়ে দিন।'

সাত্তার সাহেব ঠিকানা দিলেন।

আমি বললাম, 'আমার দিক থেকে ফিফটি ফিফটি ডিল কিন্তু এখনো আছে।' বলেই চোখ টিপলাম। সাত্তার সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না। তাঁর মধ্যে জবুথবু ভাব। ব্রেইন মনে হয় আবারো হ্যাংগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রফেসর কেরামত আলি থাকেন ধানমন্ডিতে। রোড ৩/এ, আমার ধারণা সাত্তার সাহেব আগেই টেলিফোনে আমার কথা বলে রেখেছেন। কারণ প্রফেসর সাহেব আতংকে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাকে কি জন্যে প্রয়োজন?'

আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে একটা সিগারেট খাব এই জন্যে এসেছি।'

'সিগারেট খাবেন?'

'হ্যাঁ। আপনি সিগারেট খানতো?'

'হুঁ।'

'তাহলে ধরান।'

প্রফেসর সাহেবের হাতের সিগারেট কাঁপছে। তিনি যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তা বুঝা যাচ্ছে। তিনি সিগারেট টানছেন, তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি কিছুই না বলায় তার টেনশান আরো বাড়ছে। আমি সিগারেট শেষ করে বললাম, 'প্রফেসর সাহেব যাই?'

প্রফেসর কেরামত আলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিশ্চিত এই ভদ্রলোক আজ সারারাত এক ফোটাও ঘুমাতে পারবে না।

==

কিছুক্ষণ পর পর টেলিফোন করবেন সাত্তার সাহেবকে। সাত্তার সাহেবও ঘুমাতে পারবেন না।

ওসি সাহেবের বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ফাঁকা বাসা। অনেকক্ষণ কলিং বেল বাজাবার পর ওসি সাহেবের স্ত্রী নূপুর এসে দরজা খুলল। পরীর মতো চেহারার বাচ্চা একটা মেয়ে। সে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'সজল ভাই, আপনি কোত্থেকে ? আমিতো ভেবেছিলাম এই জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তুমি উনাকে চেন ?'

নূপুর বলল, 'না, চিনি না। এম্নি এম্নি সজল ভাই ডাকছি। তুমি উনাকে নিয়ে এসেছ, এই জন্যে তোমার আগামী এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

নূপুরের চোখ ছলছল করছে। সে যে কেঁদে ফেলার আয়োজন করছে তা পরিষ্কার। এই মেয়ের সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। সে সজল ভাই সজল ভাই কেন ডাকছে কে জানে ?

ওসি সাহেব বললেন, 'লোকজন কেউ আসে নি ?'

নূপুর বলল, 'না। আমি সবাইকে টেলিফোন করে আসতে নিষেধ করেছি। আজকের দিনটা শুধু আমাদের দু'জনের, বাইরের লোক কেন থাকবে ? তবে সজল ভাই অবশ্যই থাকবেন।'

ওসি সাহেব বললেন, 'উনি কি বাইরের কেউ না ?'

নূপুর বলল, 'না।'

খাবারের আয়োজন ভাল না। খিচুড়ি এবং ডিম ভুনা। আজকের বিশেষ দিনের জন্যে উপযুক্ত খাবার নিশ্চয়ই না। ডিমও রান্না করা হয়েছে দু'টা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জন্যে ব্যবস্থা। ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'খাবার কি এই ?'

নূপুর বলল, 'হ্যাঁ এই। শোন তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি সজল ভাইকে নিয়ে পরে খাব। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা।'

ওসি সাহেব বললেন, 'খাবারটা গরম কর। দুপুরের কিছু থাকলে ফ্রিজ থেকে বের কর। ডিম ভাজ। দু'টা ডিম আমরা তিনজন কিভাবে খাব ? ভদ্রলোককে আমি প্রায় জোর করে এনেছি।'

নূপুর অনাগ্রহের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে গেল। ওসি সাহেব আমাকে বললেন, 'ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী পুরোপুরি সুস্থ কোনো মানুষ না। তার ভয়াবহ এপিলেপ্সি আছে। একেকবার এপিলেপ্সির এটাক হয় আর সে অদ্ভুত কোনো গল্প তৈরি করে। সব গল্পেই একজনের সঙ্গে তার

==

প্রণয় থাকে। যার সঙ্গে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মফস্বল কোনো শহরের কাজি অফিসে বিয়ে করে। বিয়ের পর পর সেই ছেলে স্ত্রী রেখে পালিয়ে যায়। সজল সে রকমই কেউ হবে। এপিলেপ্সি রোগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন ?'

আমি বললাম, 'জানি। এপিলেপ্সিকে বলা হয় ধর্ম প্রচারকদের রোগ। অনেক ধর্ম প্রচারক এই রোগে ভুগতেন। আমার বাবারও এই রোগ ছিল।'

'তিনি কি ধর্ম প্রচারক ?'

'হ্যাঁ তাঁর ধর্মের নাম মহাপুরুষ ধর্ম। এ বিষয়ে আপনাকে আরেকদিন বলব।'

শেষ পর্যন্ত তিনজনই খেতে বসেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, টেবিলে অনেক খাবার। পোলাও আছে, মুরগির রোস্ট আছে, খাসির মাংসের রেজালা আছে। শুরুতে শুধু দু'টা ডিম কেন দেয়া হয়েছিল কে জানে।

নূপুর বলল, 'সজল ভাই, আপনার সব কথা কিন্তু আমি আমার হাজবেন্ডকে বলে দেব। জানি আপনি রাগ করবেন। করলে করবেন।'

ওসি সাহেব বললেন, 'কথাটা না বললেই হয়। একজন এ্যামবারাসড হবে এমন কথা বলার দরকার কি ?'

নূপুর বলল, 'এ্যামবারাসড হলে হবে। আমাকে উনি কি অবস্থায় ফেলেছিলেন সেটা জান ? বিয়ে করবেন এই কথা বলে তিনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করলেন। আমি তখন বাচ্চা একটা মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ি। আমাকে নিয়ে গেলেন কুমিল্লায়, সেখানে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আমাকে তুলবেন। কুমিল্লায় গিয়ে পৌঁছলাম। সজল ভাই বন্ধুর বাড়ি আর খুঁজে পান না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তোমাদের তাহলে বিয়ে হয় নি ?'

বিয়ে কেন হবে না ? কুমিল্লায় নেমে প্রথম আমরা ঠাকুরপাড়ায় এক কাজী অফিসে বিয়ে করলাম, তারপর বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে বের হলাম।'

'ওসি সাহেব বললেন, 'বাড়ি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ?'

নূপুর বলল, 'এত কথা তোমাকে বলব না। পরে এসব নিয়ে আমাকে খোঁটা দেবে। সজল ভাই, যেমন চুপচাপ খাচ্ছেন, তুমিও তাই কর। নিঃশব্দে খাও। সজল ভাই আমার রান্না কেমন ?'

'অসাধারণ। রান্নার কমপিটিশন হলে সিদ্দিকা কবীর ফেল করবে।'

'সজল ভাই কি যে ঠাট্টা করেন! আমিতো উনার বই দেখেই রাঁধি।'

'যে রান্নার বই লেখে সে রাঁধতে পারে না।'

==

নূপুর বলল, 'সজল ভাই! কুমিল্লার এক হোটেলে আমরা কি জঘন্য খাবার খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে ? আপনি যে ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এটা কিসের মাংস ? কুকুরের না বানরের। হিঃ হিঃ হিঃ।'

হাসতে হাসতে মেয়েটা গড়িয়ে পড়ছে। ওসি সাহেব দুঃখিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বাজল। ওসি সাহেব গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসার দরজা তালাবন্ধ। দারোয়ান বলল, 'স্যার সন্ধ্যাবেলা রিকশা করে কোথায় যেন গেছেন। সঙ্গে চার-পাঁচটা বই ছিল। দারোয়ান নিজেই রিকসা ডেকে দিয়েছে।'

পল্টু স্যার দারোয়ানের কাছে চাবি এবং চিঠি রেখে গেছেন। আমি বাসায় ফিরলে আমাকে যেন চিঠি এবং চাবি দেয়া হয়।

চিঠিতে লেখা—

হিমু,

অংকের একটা বই পড়তে পড়তে লকারের কম্বিনেশন নাম্বারটা মনে পড়ল। আমি ফিবোনাচ্চি সিরিয়েল ব্যবহার করেছি। ফিবোনাচ্চি সিরিয়েল হচ্ছে এর যে কোন সংখ্যার আগের দুটি সংখ্যার যোগফল। লকারের নাম্বারটা এই ভাবেই পেয়ে যাবে।

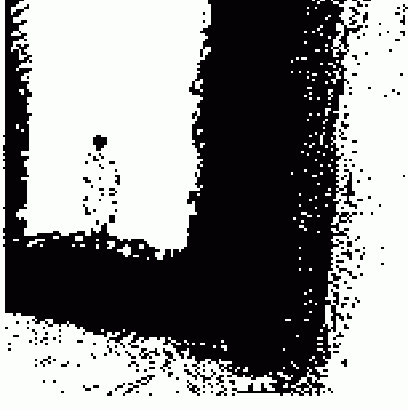
নানান কারণে গৃহত্যাগ করলাম। ডাক্তাররা খোঁচাখুচি করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে, এটা আমার ভাল লাগছে না। অন্যের কিডনী নিয়ে বাঁচার প্রশ্নই উঠে না।

আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না। যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে হারিয়ে যেতে দিতে হয়।

ইতি

তোমার স্যার।

==



ফিবোনাচ্চি সিরিয়েলের প্রথম সাতটি সংখ্যা

১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১

আমি চাচ্ছিলাম সবার সামনে লকার খুলতে। তা সম্ভব হল না। সাত্তার সাহেব হাজতে। পুলিশের ধারণা তিনিই পল্টু স্যারকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, কিংবা গুম খুন করেছেন।

বাদল রানুকে পাওয়া গেল না। তারা হানিমুনে কাঠমুণ্ডু গিয়েছে। তারা যেদিন গেছে তার একদিন পর খালু সাহেবও চলে গেছেন। বৌমাকে না দেখে তাঁর না-কি অস্থির লাগছিল।

লকার খোলার সময় মাজেদা খালা ছিলেন। ওসি সাহেব ছিলেন।

লকারে সীল গালা করা দলিল পাওয়া গেল। দলিল পড়ে জানা গেল তিনি তাঁর সব কিছু দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

দলিল পড়ে ওসি সাহেবের চোখ ছলছল করতে লাগল। তিনি বললেন, 'পুলিশদের সমস্যা কি জানেন ? তারা সব সময় খারাপ লোকদের দেখে চোর, ডাকাত, খুনি, ধর্ষক...। ভাল মানুষদের সঙ্গে তাদের দেখা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ যখন দেখা হয় তারা আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ে।'

মাজেদা খালা বললেন, ইস এতগুলো টাকা খামাখা নষ্ট। ওসি সাহেব কঠিন চোখে মাজেদা খালার দিকে তাকানোয় তিনি ঝিম মেরে গেলেন।

আমি আগের জীবনে ফিরে গেছি। পথে হাঁটা। আগে বেশির ভাগ সময় রাতে হাঁটতাম, এখন হাঁটি দিনে। যদি হঠাৎ পল্টু স্যারের দেখা পাওয়া যায়।

সেই সম্ভাবনা অবশ্যি ক্ষীণ। উনি মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। এ ধরনের মানুষরা ডুব দিয়ে আড়ালে চলে যেতে চাইলে তাদের খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না।

একদিন দেখা হয়ে গেল কিসলুর সঙ্গে। সে জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে তিন সাইজ বড় একটা মেরুন রঙের শার্ট পরে হাঁটছে। আমাকে হঠাৎ দেখে

===

থমকে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগের পজিশন। যে কোনো মুহূর্তে অলিম্পিক দৌড় দেবে। আমি বললাম, কি অবস্থা ?

'জ্বি। ভাল অবস্থা ?'

'পিস্তলের গুলি পাওয়া গেছে ?'

'জ্বি না।'

'গুলি ছাড়া পিস্তলতো ছুরি কাঁচির চেয়ে নিম্নস্তরের অস্ত্র। কোনো একটা মজা পুকুর দেখে ফেলে দাও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'চল একজনের কাছে নিয়ে যাই। সে নতুন ধারার রান্নার রেসিপি জানে।'

'রান্নার রেসিপি দিয়ে আমি কি করব ?'

'একটা বিদ্যা শিখা থাকল। কোন বিদ্যা কখন কাজে লাগে কিছুইতো বলা যায় না।'

'একটা জরুরি কাজ ছিল।'

'তোমার যে কাজ, দুপুর তার জন্যে উপযুক্ত সময় না। চল যাই ঘুরে আসি।'

কিসলু বিরস মুখে বলল, 'চলুন।'

তাকে নিয়ে গেলাম হাজতে দেখা হওয়া থুথুওয়ালার কাছে। সে থাকে কলাবাগানের সামনের নার্সারিতে। মালির কাজ করে। কিসলুকে দেখে সে বলল, রক্তের পুডিং কিভাবে রানতে হয় জানেন ভাইজান ? এক গামলা টাটকা রক্ত নিবেন। পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ দিবেন...

কিসলু বিড় বিড় করে বলল, 'একি পাগল ?'

আমি বললাম, 'নাহ্।'

'রক্তের পুডিং বানাতে চায় সে পাগল না ?'

'তুমি গুলি করে রক্ত বের কর তোমাকে কেউ পাগল বলে না। আর এই বেচারা রক্তটাকে দিয়ে একটা খাদ্য বানানোর কথা বলছে তাকে পাগল বলছ। কথাটা কি ঠিক ?'

কিসলু চুপ করে রইল। থুথুওয়ালা বলল, 'হিমু ভাই, আপনার জন্যে একটা গাছের চারা আলাদা করে রেখেছি একদিন এসে নিয়ে যাবেন।'

'গাছের নাম কি ?'

'দুপুর মণি। ঠিক দুপুরে ফুটে। টকটকা লাল রঙের ফুল। বিরাট সৌন্দর্য।'

কিসলু আমার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাচ্ছে। সাহস করে বলতে পারছে না। আমি বললাম, তোমার বন্ধুর খবর কি ? সোহাগ! সে আছে কেমন ?

==

'জানি না।'

'জান না কেন ? বন্ধু, বন্ধুর খোঁজ রাখবে না! তোমার মত লোকজনদের একা চলাফেরা করাও তো বিপজ্জনক।'

'বিদায় দেন যাই। জরুরি কাজ ছিল।'

'তোমাকে যখন পেয়েছি, এত সহজে ছাড়ছি না। চল দুই ভাই মিলে একটা ছিনতাই করি।'

'কি বললেন ?'

'গুলি হোক বা না হোক, তোমার সঙ্গেতো একটা পিস্তল আছেই ? ব্রীফকেস হাতে এমন কাউকে আটকাও। ব্রীফকেস রিলিজ করে আমার কাছে দাও। আমি ঝেড়ে দৌড় দিব।'

কিসলু এই পর্যায়ে নিজেই ঝেড়ে দৌড় দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক পত্রিকা হকারের উপর। হকার গলা উচিয়ে বলল, ধর ধর।

ঢাকা শহরে কেউ একজন ধর ধর বলা মানে মহা বিপদ। চারদিক থেকে ধর ধর শুরু হয়ে গেল। কিসলু প্রাণ পণে ছুটছে। তার পেছনে পেছনে অনেকেই ছুটছে। এদের সঙ্গে জুটেছে একজন পুলিশ সার্জেন্ট। মনে হয় বেচারার আজকের আমদানি ভাল হয় নি। পুলিশ সার্জেন্টের আমদানি ভাল না হলে তারা আহত বাঘের মত হয়ে যায়। তখন তারা অসীম সাহসে ছিনতাইকারী ধরে।

কিসলুর পরিণতি দেখার জন্যেই আমাকে ছুটে যেতে হল। সে সার্জেন্টের হাতেই ধরা খেয়েছে। গণধোলাই শুরুর আগের অবস্থায় আমি উপস্থিত হয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলাম। পল্টু স্যারের ড্রাইভারের কারণে চোখ টিপটা আমি বেশ ভাল রপ্ত করেছি। পুলিশ সার্জেন্ট আমার চোখ টিপে উৎসাহিত। ধরেই নিয়েছেন আমদানী ভাল হবে। ব্যাংকে এলসি খোলা হয়ে গেছে। তিনি কঠিন গলায় বললেন, ভীড় করবেন না। যে যার কাজে চলে যান। একে আমি থানায় নিয়ে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

জাগ্রত জনতা নিভে গেল। তবে তারা এত সহজে অকুলস্থল ছেড়ে যাবার মানসিকতা নেই। আমি উঁচু গলায় বললাম, এ আমার আপন ভাইগ্না। হেরোইন খায়। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছে। এক সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছি— হঠাৎ মানিব্যাগ তুলে নিয়ে দৌড়। একে থানায় দিয়ে কোনো লাভ আছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে। আমি বরং একে কানে ধরে তার মা'র কাছে নিয়ে যাই। আপনারা চলে যাবেন না। আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসুন।

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি বললাম, 'পুলিশের সঙ্গে আমার কথা নাই। ইচ্ছা করলে আপনিও মোটর সাইকেল নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসুন।'

ঢাকা শহরে অনেক দিন পর একটা মজার দৃশ্যের অবতারণা হল। আমি কিসলুর কানে ধরে এগুচ্ছি। আমার পেছনে জাগ্রত জনতা। সবার শেষে মোটর সাইকেলে পুলিশ সার্জেন্ট। জনতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আমি কিসলুর কানে কানে বললাম, তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। এ ছাড়া গতি নাই। বাসা কোথায় ?

'কাওরান বাজার।'

'মা বাসায় আছেন তো ?'

'হু।'

ঢাকা শহরে যারা ঘোরাঘুরি করে তাদের বেশির ভাগেরই কোনো কাজ নেই। সবাই জুটে যাচ্ছে। মিছিলে মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকল। আমার ধারণা আজকের এই ঘটনার পর কিসলুর রূপান্তর হবে। ভালোর দিকে না-কি আরো মন্দের দিকে তা বলা অবশ্য বেশ কঠিন। অসম্ভব ভালো এবং অসম্ভব মন্দের বিভাজন রেখা অতি সূক্ষ্ম।

মাঝে মাঝে আমি খালু সাহেবের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে উত্তেজিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাদল বিষয়ে উত্তেজনা।

'বাদলের কাণ্ড শুনেছ ?'

'নতুন কিছু করেছে ?'

'নতুন কিছু না। সেই পুরানো গীত। বৌমার সঙ্গে ঝগড়া। বৌমা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।'

'আপনি বললেই তো খাওয়া শুরু করবে।'

'আমি কেন বলব ? প্রতিবার আমাকে কেন ঝামেলা মিটাতে হবে ?'

'আপনার কথা রানু ফেলতে পারবে না বলেই যা করার আপনাকে করতে হবে।'

'আমি যখন বেঁচে থাকব না, তখন কি হবে ?'

'তখন একটা বিরাট সমস্যা হবে।'

'বৌমার জন্যে আমি টেনশানে অস্থির হয়ে থাকি। এত ডিপেনডেন্ট আমার উপর। সেদিন শাড়ি কিনবে রঙ পছন্দ করতে পারছে না। দোকান থেকে টেলিফোন করেছে। বাধ্য হয়ে অফিস বাদ দিয়ে গেলাম।'

'কি রঙ পছন্দ করলেন ?'

'দুইটা শাড়ি ছিল, একটা হালকা সবুজ আর একটা কফি কালার। আমি কফি কালারটা পছন্দ করলাম।'

'আপনার দিনতো খালু সাহেব ভালই যাচ্ছে।'

খালু সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার মত ভান করে বললেন, 'এটাকে তুমি ভাল বলছ ? বিশাল যন্ত্রণায় আছি। ঐ দিন তোমার খালার সঙ্গে রাগ করে বললাম, ভাত খাব না। বৌ মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবা খাবে না। কাজেই আমিও খাব না। তোমার খালা গেল আরো রেগে। বিরাট ক্যাচাল শুরু হয়ে গেল।'

খালু সাহেবের সঙ্গে যতবারই কথা হয় আনন্দ পাই। একটা মানুষ জগতের আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছে, এটা অনেক বড় ব্যাপার। আনন্দ যজ্ঞে আমাদের সবার নিমন্ত্রণ। কিন্তু আমরা নিমন্ত্রণের কার্ড হারিয়ে ফেলি বলে যেতে পারি না। দূর থেকে অন্যের আনন্দ যজ্ঞ দেখি।

একদিন হাজতে সাত্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অল্প কিছুদিন হাজত বাসের কারণেই ভদ্রলোক বুড়িয়ে গেছেন। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। আমাকে দেখে হাহাকার করে উঠলেন।

' বাবা, আমাকে এই নরক থেকে বের করতে পারবে ?'

'পল্টু স্যারকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এরা আপনাকে ছাড়বে না।'

'ওদেরকে বল, আমি খুঁজে বের করব। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার অনেক সিস্টেম আছে। ঝাড়-ফুঁক আছে। জ্বীন দিয়ে তদবিরের ব্যবস্থা আছে। যারা এসব করে তাদেরকে আমি চিনি।'

'দেখি কিছু করতে পারি কি-না।'

'তুমি অবশ্যই করতে পারবে। তোমার কথা এরা শুনবে এখানে এক হারামজাদার সঙ্গে আমাকে রেখেছে, সে রোজ রাতে আমার গায়ে পেশাব করে। তাকিয়ে দেখ কালো গেঞ্জি গায়ের বদমাইশটা।'

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালার দিকে তাকালাম। সে দাঁত বের করে বলল, 'গত রাতে পেশাব করি নাই, স্যার। উনারে জিজ্ঞেস করে দেখেন। যদি মিথ্যা বলি, আমি মানুষের জাত না।'

সাত্তার সাহেব ধরা গলায় বললেন, কার সাথে আমাকে রেখেছে দেখেছ ? এরচে মরণ ভাল না ?

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, কথা সত্য স্যার।

সাত্তার সাহেব বললেন, এম্নিতেই সারা রাত ঘুম হয় না। হঠাৎ যদি কোনো কারণে চোখ লাগে এই বদমাইশটা পা দিয়ে খোঁচা দেয়।

==

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, গফ সফ করার জন্যে আপনেরে জাগাই।

'তোর সঙ্গে কি গল্প করব ?'

'আমি দুইটা মার্ডার করছি এই গপ শুনবেন ?'

'না— চুপ থাক।'

শুনেন না। মজা পাইবেন। রাইতে হাতে ইট নিয়া ঘুরতাছি শোয়ার জায়গা পাই না। ভাল জায়গা পাইলে মাথার নিচে ইট দিয়া ঘুম দিব। হঠাৎ দেখি সাত আট বছরের এক পুলা ঘুমাইতাছে। সুন্দর চেহারা। ইট নিয়া আগাইলাম। মাথাত বাড়ি দিয়া মাথা থেতলায়া দিব এই আমার চিন্তা।...।

সাত্তার সাহেব বললেন, আর বলবি না। চুপ চুপ।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, চুপ চুপ কইরা লাভ নাই তোরে পুরা গল্প শুনতে হবে।

সাত্তার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, হিমু এর হাত থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার কর। তোমাকে আমি কথা দিলাম আমি মক্কা শরীফে যাব। সেখানে তওবা করে শুদ্ধ হব।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, স্যার আমারে সাথে নিবেন ? আমি তওবা করব না। আমি দেখব। আমি তওবা বিশ্বাস করি না। পাপ করলে শাস্তি। তওবা আবার কি ? আমি শাস্তির জন্যে তৈয়ার। একবার একজনের বিচি ফালায়া খাসি বানায়া দিছিলাম। আমি একা না। আমরা ছিলাম তিন জন। দুই জন চাইপ্যা ধরছে। আমি অপারেশন করছি।

সাত্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বলছে শুনছ ? এই রকম একজনের সঙ্গে বাস করছি।

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, সুযোগ পাইলে আপনের উপরে একটা অপারেশনের ইচ্ছা আছে। একলা পারব না। আরো দুই তিন জন হাজতে ঢুকলে তারারে দলে টাইন্যা একটা চেষ্টা নিব। স্যার ছেপ খাবেন ?

সাত্তার সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, ছেপ খাব মানে!

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, হা করেন। মুখে ছেপ দেই। খায়া দেখেন মজা পাবেন। দুষ্ট লোকের ছেপ খাইতে মজা। সাধু লোকের ছেপে মজা নাই। স্যার হা করেন।

আমি সাত্তার সাহেবকে এই অবস্থায় রেখে চলে এলাম। তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এর জন্যে তাকে নরকে যেতে হয় নি। পৃথিবীতেই তাঁর জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাপারগুলো কি কাকতালীয়ভাবে ঘটে ? না কেউ একজন ব্যবস্থা করে দেন ? এই বিষয়ে বিখ্যাত একটা কবিতাও আছে—

==

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষেতে সুরাসুর।

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালাকে দেখেছি— সে উত্তর মেরু হলে দক্ষিণ মেরুর একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। রোগা গাত্র বর্ণ ধবধবে সাদা। হলুদ রঙের একটা শার্ট পরেছেন। শার্ট ছাপিয়ে তাঁর গায়ের রঙ ছিটকে বের হচ্ছে। তিনি বড় একটা এলুমিনিয়ামের হাড়ি হাতে ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয় আয় বলে কাকে যেন ডাকছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম, কাকে ডাকছেন ?

তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, কাকদের ডাকছি। ওদের জন্যে খিচুরি রান্না করে এনেছি।

'একটু বুঝিয়ে বলবেন ?'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, কাকরা সারাজীবন আবর্জনা খায়। ভাল কিছু খেতে পারে না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমি ওদের খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াই।

'কতদিন পর পর খাওয়ান।'

'মাসে দু'বারের বেশি পারি না। আমি গরিব মানুষ।'

ভদ্রলোক পাতিলের ঢাকনা খুলে দিয়েছেন। কাকরা এসে খিচুড়ি খাচ্ছে। তিনি আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে বের হচ্ছে। আমি দ্রুত দূরে সরে গেলাম কারণ আমার বাবা বলে গেছেন—

"তোমার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তুমি
কিছু মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষের
সাক্ষাত পাইবে। অতি অবশ্যই তুমি
তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হাত
দূরে থাকিবে। কারণ মহাপুরুষদের
আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। একবার
তাহাদের আকর্ষণী ক্ষমতার ভিতর
পড়িলে আর বাহির হইতে
পারিবে না। তাহাদের বলয়ের
ভিতর থাকিয়া তোমাকে চক্রাবার
ঘুরিতে হইবে। ইহা আমার
কাম্য নয়।"

==

এক দুপুরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা। তিনি গ্লাস ভর্তি করে আখের রস খাচ্ছেন। তৃপ্তিতে তাঁর চোখে খুশি খুশি ভাব এসে গেছে।

'এই হিমু! এদিকে আয় আখের রস খাবি ?'

'খাব।'

'একে গ্লাস ভর্তি করে দাও। বরফ কুচি বেশি দেবে।'

আমি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি। বরফের কুচি মুখে ঢুকে চিড়বিড় ভাব হচ্ছে। ভাল লাগছে।

'পল্টু ভাইজানের শোবার ঘর থেকে ছবিটা আমি নিয়ে এসেছি। ছবিটা আমি আমার শোবার ঘরে টানিয়েছি।'

'ছবিটার কোনো নাম দিয়েছ ?'

'নাম দেব কেন ?'

'এত সুন্দর একটা ছবি নাম ছাড়া মানায় না। মোনালিসার সঙ্গে মিল দিয়ে ছবির নাম দাও 'মাজেলিসা।' মাজেদা থেকে মাজেলিসা।'

'চুপ করে আখের সরবত খা। উদ্ভট উদ্ভট কথা।'

'তুমি রোজ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাক।'

'তা থাকি। এতে মনটা খারাপ হয়। কি ছিলাম আর কি হয়েছি। আগে মনটাও ছিল সরল। এখন কুটিল হয়ে গেছে।'

'উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল খালা। মধ্য দুপুরেই শুধু মানুষের ছায়া পড়ে না। মানুষ হয় ছায়াশূন্য।'

'এর মানে কি ?'

'কোনো মানে নেই এম্নি বললাম।'

'উল্টাপাল্টা কথা আমাকে বলিস নাতো! বুঝতে পারি না। মাথা এলোমেলো লাগে। আরেক গ্লাস সরবত খাবি ?'

'খাব।'

খালা আরো দু'গ্লাসের অর্ডার দিলেন।

'পল্টু ভাইজানের কোনো খোঁজ পেয়েছিস ?'

'না। মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষতো! নিজেরা ধরা না দিলে ধরা যায় না।'

'পত্রিকায় ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দে।'

'কি দরকার ?'

'একটা মানুষ এম্নি এম্নি হারিয়ে যাবে ?'

'মানুষের জন্মই হয়েছে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

==

'ফিলসফির কথা আমাকে বলবি না। থাপ্পড় খাবি।'

আমি চুপ করে গেলাম। আখের রসে মন দিলাম। আজকের রস অন্যদিনের চেয়ে ভাল হয়েছে। অমৃতের কাছাকাছি। রস থেকে পুদিনা পাতার গন্ধ আসছে। যদিও কোনো পাতা দেখা যাচ্ছে না। দার্শনিকভাবে বলা যায়— "সে নেই তার গন্ধ রেখে গেছে।"

এক রাতে ওসি সাহেব তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে কৈ মাছ এসেছে। নানান পদের কৈ মাছ হবে। কৈ উৎসব।

বাসায় পৌঁছে দেখি জটিল অবস্থা। ওসি সাহেবের কাজের মেয়ে চুরি করে পালিয়েছে। গয়না টাকা-পয়সা নিয়েছে। কত টাকা, কি কি গয়না এখনো বের হয় নি। কারণ ওসি সাহেবের স্ত্রীর নূপুরের এপিলেপটিক এটাক হয়েছে। সে আধমরার মতো শুয়ে আছে।

ওসি সাহেব বললেন, 'কাজের মেয়েটা টাকা গয়না নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি, যে হাড়িতে করে কৈ মাছ পাঠিয়েছে সেটাও নিয়ে গেছে। নূপুর বলল, মেয়েটা যখন চুরি করছিল তখন আমার এটাক শুরু হয়েছে। আমি চোখের সামনে ছায়া ছায়া ভাবে দেখছি সে চাবি দিয়ে আলমিরা খুলছে। টাকা বের করছে। অথচ আমার কিছুই করার নেই।'

আমি বললাম, 'তুমি কি একটু উঠে বসতে পারবে ? আমার একটা ঘুম ঘুম খেলা আছে। এই খেলাটা খেলতাম। খেলাটা ঠিকমতো খেলতে পারলে এপলেকটিক অসুখটা ভাল হয়ে যাবার কথা।'

ওসি সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'প্লীজ! প্লীজ।'

আমি বললাম, 'নূপুর আমি তোমাকে যা চিন্তা করতে বলব, তাই চিন্তা করবে। চোখ বন্ধ কর।'

নূপুর চোখ বন্ধ করল।

'এখন তুমি আছ একটা গভীর বনে। চারদিকে বিশাল সব বৃক্ষ। আলো ছায়া ? খেলা। তুমি আপন মনে ঘুরছ। তোমার চারপাশে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে। বাড়িটা অনেক উঁচুতে। সেখানে উঠার কাঠের সিঁড়ি আছে।

সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠছ। কারণ তুমি জান কাঠের বাড়িতে তোমার জন্যে এক আনন্দময় বিস্ময় অপেক্ষা করছে। তুমি একের পর এক সিঁড়ি ভাঙছ। যতই উপরে উঠছ ততই তোমার শীত শীত লাগছে এবং ঘুম পাচ্ছে। অনেক কষ্টে তুমি ঘুম আটকে রেখেছ। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আর আনন্দময় বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে পাবে না।

এখন তুমি কাঠের ঘরের দরজার সামনে। দরজায় হাত রাখা মাত্র দরজা খুলে যাবে। দরজায় তুমি হাত রেখেছ। দরজা খুলে যাচ্ছে। নূপুর, তুমি কি দেখছ ?

'দেবশিশুর মতো একটা ফ্রক পরা বাচ্চা মেয়ে বসে আছে। সে মনে হয় রাগ করেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে রেখেছে।'

'মেয়েটা কার নূপুর ?'

'মনে হয় আমার।'

'হাত বাড়াও। হাত বাড়ালেই মেয়েটা ঝাঁপ দিয়ে তোমার কোলে এসে পড়বে। হাত বাড়াও। এখন মেয়েটা কোথায় ?'

'আমার কোলে।'

'দেখ ঘরে একটা খাট আছে। খাটে বিছানা করা। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে খাটে উঠে পড়। এখন দু'জনই ঘুমাও। তোমার খুব শান্তির ঘুম হবে। এই ঘুম যখন ভাঙবে তখন তোমার মাথার অসুখটা সেরে যাবে। আর কখনো মাথায় ঝড় উঠবে না।'

নূপুর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ওসি সাহেব দৌড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ওসি সাহেবের চোখ ভর্তি বিস্ময়। তিনি আমার হাত ধরে কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, 'নূপুর কি সত্যি ভাল হয়ে যাবে ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। এতো বিশ্বাস কোত্থেকে পেলাম কে জানে। আমি বললাম, আপনাদের পরীর মতো রূপবতী একটা মেয়ে হবে। অবিকল রূপার মতো। তাকে নিয়ে আপনাদের হবে সোনার সংসার।'

'রূপা কে ?'

'আছে একজন। সে আমার জন্যে অদ্ভুত সারপ্রাইজ নিয়ে অপেক্ষা করে। আমি কখনো তা দেখি না।'

'কেন দেখেন না ?'

'দেখলেইতো সারপ্রাইজ নষ্ট। ভাই, আমি বিদায় নিচ্ছি।'

এখন মধ্যদুপুর।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমার হাতে দুপুরমণি গাছের চারা। অপেক্ষা করছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের যখন আমার ছায়া পড়বে না এবং দুপুরমণি গাছে ফুল ফুটবে। অস্পষ্টভাবে মনে হল বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'হিমু! বাবা শোন, আমার দীর্ঘদিনের সাধনা নষ্ট হয় নি। তোকে দেখে বড়ই আনন্দ হচ্ছে।'

'বাবা আমি কি মহাপুরুষ হয়ে গেছি ?'

'বলা কঠিন।'

'কঠিন কেন ?'

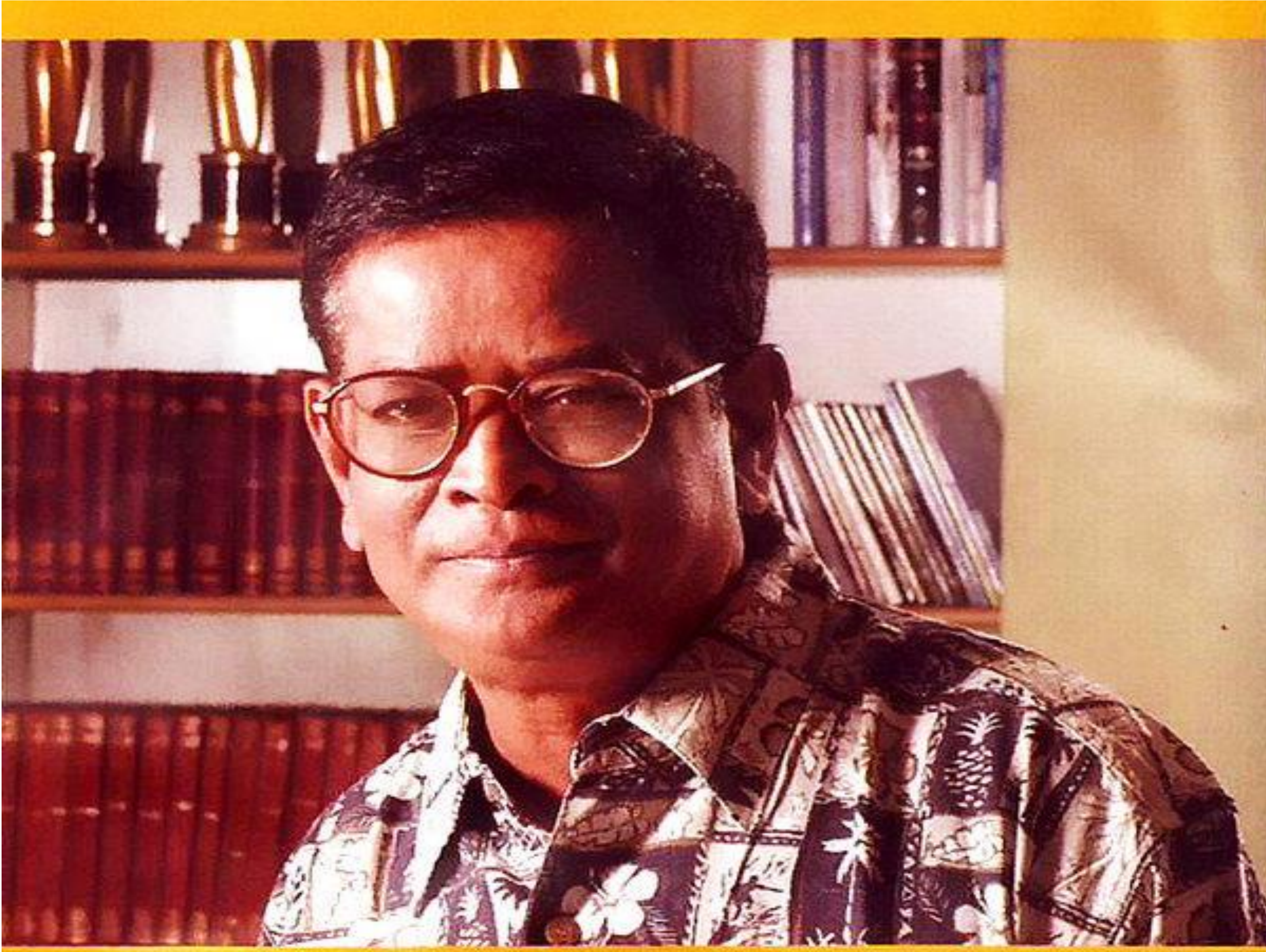
'সব মানুষের মধ্যেই একজন মহাপুরুষ বাস করেন। তাঁরা কখনো প্রকাশিত হন। কখনো হন না। সমস্যা এইখানেই। তুই তোর মা'র ছবিটা দেখেছিস ?'

'না।'

'দেখবি না ?'

আমি জবাব দিলাম না। আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে এখন কথা বলার সময় না।

নৈঃশব্দের সময়।



বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, আমার আছে জল... ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।